কৃশানু

শারদীয় ১৩৮৬

কলকাতা দুর্বার হোক

তিনশো বছরের শৈশবেই এই মহানগর আজ জীর্ণ ও শ্লথগতি। অসহনীয় ভারে ক্লিষ্ট ও ন্যুব্জ। তার পদক্ষেপ আজ ব্যাহত। দুরন্ত অশ্বের মতো তার কেশর আন্দোলিত হোক। পায়ের খুরে সঞ্চালিত হোক গতিবেগ। কলকাতা দুর্বার হোক সমৃদ্ধ ভবিষ্যতের দিকে। স্বচ্ছন্দ ও সুন্দর জীবনের উদ্দেশে। এই প্রার্থনা আমার আপনার সকলের। কলকাতাকে যারা ভালবাসি।

মন্থরতার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ

মেট্রো রেলওয়ে

medium

In View of Ensuing Cricket Test Against Australia & Pakistan

ATTENTION - ALL TV VIEWERS

- Do you live in a fringe area, and so hesitate to install a TV set ?
- Do you get Bangladese programmes in your TV set ?
- Do man-made electrical noises mar your pleasure of TV Viewing ?

"Here is a heartening news for you "

TNK Telebooster solves the above problems —Ensures trouble-free TV reception within at least 300 miles.

Consult—TNK ELECTRONIKS

93/2B, BIDHAN SARANI,
CALCUTTA-700001.

Phone : 55-7940 / 55-6005

Mfrs. of : **TELEBOOSTERS (Ac & Dc)**

Band III Antennas
Automatic Voltage Stabilizers
Cassette Tape Recorders.

AVAILABLE with all Leading RADIO/TV Dealer

পূজোয় চাই
নতুন জুতো
Bata
লিলিপুট ৪৫
সাইজ ৫-৮
ব্যালেরিনা ৪৬
সাইজ ৯-১১ ১২-১, ২-৫

চাকরি কি ভাবে পাওয়া যায়

চাকরি কোথায় খালি আছে, কার কাছে আবেদন করতে হবে, কখন করতে হবে এবং কিভাবে করতে হবে তা জানতে হলে নিয়মিত পড়ো All India Appointment Gazette (A. I. A. G.) সাপ্তাহিক ২০ পয়সা, বার্ষিক সডাক চাঁদা ১৪ টাকা। ইঞ্জিনীয়ারিং-এ গ্র্যাজুয়েট ও ডিপ্লোমা-ধারীদের পড়া উচিত Engineers Appointment Gazette (EAG) সাপ্তাহিক ৬০ পয়সা, বার্ষিক সডাক চাঁদা ৩৬ টাকা। আবেদন পত্র পাঠিয়েই চুপচাপ বসে থেকো না। প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য নিজেকে তৈরী করো। এর জন্য তোমাকে নিয়মিত পড়তে হবে Competition Leader (C. L) মাসিক ২ টাকা, বার্ষিক সডাক চাঁদা ২০ টাকা। এইসব পত্রিকার চাঁদা নগদে বা ডাকযোগে পাঠাবার ঠিকানা Circulation Manager, AIAG/EAG/CL, 7, Old Court House Street, Caloutta-700001

যারা চাকরির জন্য আবেদন করবে, ন্যূনতম যোগ্যতা থাকলে তাদের প্রত্যেককেই লিখিত পরীক্ষার জন্য ডাকবে ব্যাঙ্কিং সার্ভিস রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, স্টেট ব্যাঙ্ক রিক্রুটমেন্ট বোর্ড, রেলওয়ে সার্ভিস কমিশন, স্টাফ সিলেকসন কমিশন, পাবলিক সার্ভিস কমিশন ইত্যাদি। কিন্তু চাকরির পরীক্ষা-পদ্ধতি ও প্রশ্নধারা স্কুল কলেজের পরীক্ষা পদ্ধতি থেকে সম্পূর্ণ অন্য রকম। এর জন্য দরকার এই নূতন পরীক্ষা পদ্ধতিতে যারা বিশেষজ্ঞ তাদের কাছে ট্রেনিং নেওয়া। যদি ব্যাঙ্কে চাকরি চাও তাহলে ট্রেনিং নিতে হবে Institute of Banking Services থেকে। যে কোন গ্র্যাজুয়েট প্রবেশনারী অফিসার বা ম্যানেজমেন্ট ট্রেনী পদের জন্য আবেদন করতে পারে। ম্যাট্রিক বা মাধ্যমিক বা সমতুল্য যে কোন পরীক্ষায় পাশ ছেলেমেয়েরা ক্লার্ক, ক্যাশিয়ার, টাইপিষ্ট ইত্যাদি পদের জন্য আবেদন করতে পারে। বয়স ১৮-২৬ (তপশীলিদের ১৮-৩১)। আর যদি রেলের চাকরিতে আগ্রহী হও তাহলে ট্রেনিং নিতে হবে Institute of Railway Services থেকে। ১৮ থেকে ২৫ এর মধ্যে (তপশিলীদের ১৮-৩০), ম্যাট্রিক বা মাধ্যমিক বা সমতুল্য যে কোন পরীক্ষায় পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারে। এই Institute দুটি Correspondence Course এর মাধ্যমে অর্থাৎ ডাকযোগে ট্রেনিং দেয়। প্রস্পেক্টাস ও ফর্মের জন্য নিজের নাম ঠিকানা লেখা ৪৫ পয়সার ডাকটিকিট লাগানো বড় খাম পাঠাবে—Programme Director, IBS, IRS, 7 Old Court House Street, Calcutta-700001 এই ঠিকানায়। কোন্ চাকরিতে তুমি আগ্রহী তা চিঠিতে স্পষ্ট করে লিখে দেবে।

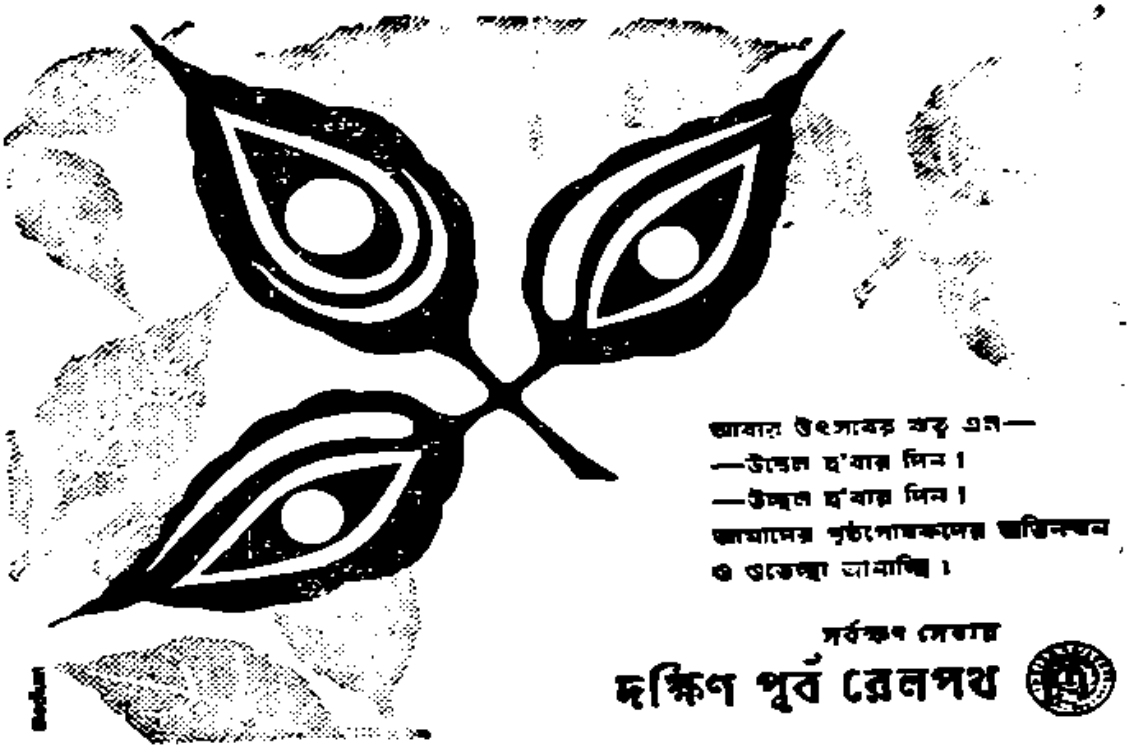

With best compliments from :

General Agency & Trading Co.

Government Contractors and
General Order Suppliers

14/2, Old China Bazar Street,
(Room No. 142)
CALCUTTA-1.

Telephone : 26-8156
26-1538

Space donated by :

An Well-Wisher

Space donated by :

Phone : 24-3771 **Post Box No. 7819**

EASTERN TRADERS

45-A, Dhiren Dhar Sarani,
CALCUTTA-12.

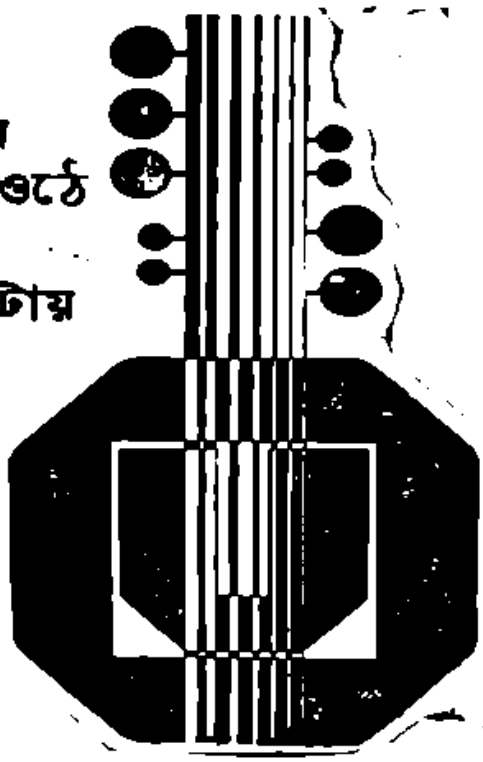

ছন্দ
সমন্বয়
গড়ে ওঠে
যৌথ
প্রচেষ্টায়

ইউনাইটেড
কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী
করে তুলতে সাহায্য করছে

With best compliments from :

KESORAM INDUSTRIES &
COTTON MILLS LTD.

Head Office and Registered Office :
9/1, R. N. Mukherjee Road,
CALCUTTA-700001.

For Assured Success—
Always Insist on TIGER Brand Fertiliser Mixture.

Manufacturer :

M/s. Nandy Dey Private Limited

P. O. SAINTHIA ● DIST. BIRBHUM
Gram : 'BEHARIDE' Phone : SNT. 44 & 11

Head Office :

67/49, Strand Road, Calcutta-700001.
Gram : 'GLOTBIS' Phones : 33-9711 (4 lines)

Space donated by :

SHOBHA

House of Sarees

P-35, COTTON STREET,
CALCUTTA-700007.

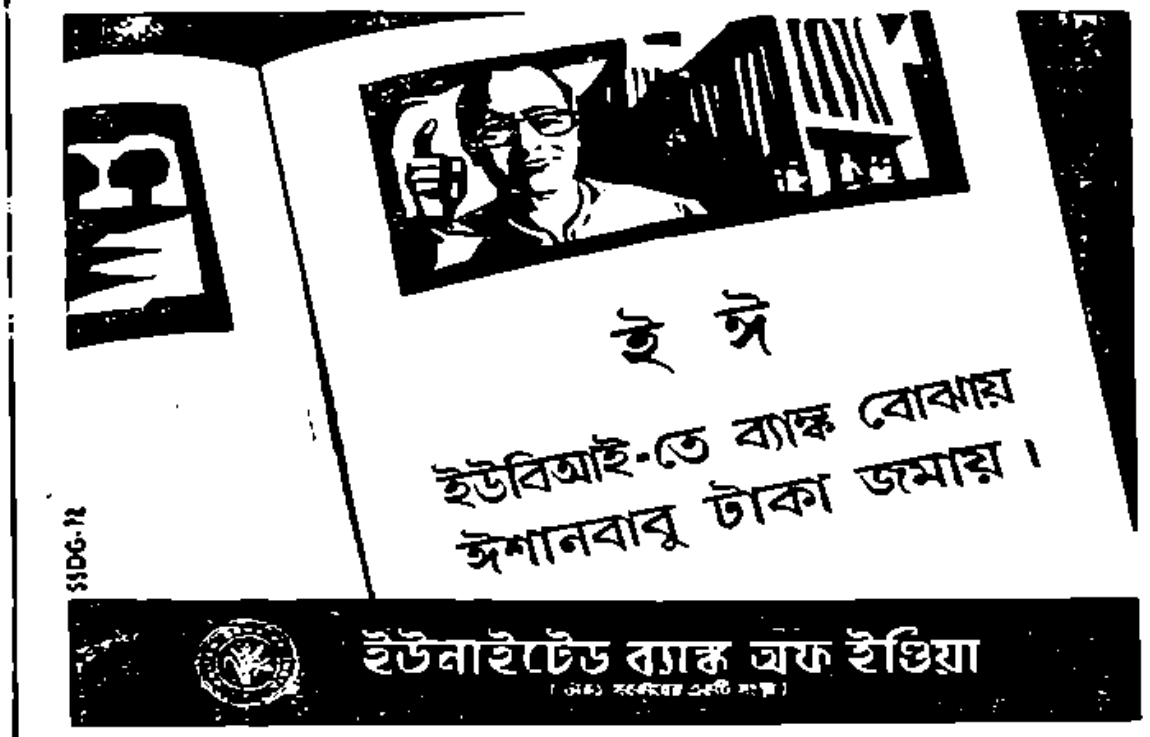

CRYSTAL

FOR

WATER TREATMENT PLANT

Range of Crystal's Products

Pressure Filter
Gravity Filter
Iron Removal Filter
Taste & Odour Removal Filter
Clarifier and Settling Tank
Swimming Pool Refiltration Plant
Hypochlorinator
Duplex Strainer & Other Equipment

Crystal Filter Company

33/1/1, Natabar Paul Road
Howrah-1, West Bengal.
Phone : 66-2420

শারদীয় শুভেচ্ছাসহ :

নির্মল মুদ্রণ

৮, ব্রজদুলাল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

ফোন : ৩৩-৮৮৪৯

মেসার্স পি. কে. নাথ

॥ ডিলার ॥

যাবতীয় সার, বীজ, কীটনাশক

হাবড়া, ২৪ পরগণা

সাবধান

জীবন বিপন্ন করবেন না

প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোন কোন সময় বিজলি তার ঝুলে পড়া অসম্ভব নয়। কিন্তু ভুলেও ঐ তারের ধারে কাছে যাবেন না। কোনরকমে ছোঁয়া লাগলে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে প্রাণহানি ঘটাও বিচিত্র নয়। কিংবা প্রাণে বাঁচলেও সারাজীবন পঙ্গু হয়ে থাকতে পারেন। নজর রাখবেন যাতে কেউ এ ধরনের তারের কাছাকাছি না যায়—গৃহপালিত জন্তু জানোয়ারদেরও দূরে রাখবেন। এ ধরনের মাটিতে নুয়ে পড়া তার দেখে বোঝা যায় না তাতে বিদ্যুৎ সরবরাহ আছে কি নেই। বিদ্যুৎ কর্মীরা সব সময়ই এ ধরনের দুর্বিপাকের জন্যে তৈরি এবং সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নেয়, তবুও যদি কখনও এ ধরনের পড়ে থাকা তার চোখে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে পর্ষদের নিকটবর্ত্তী অফিসে খবর দিন। বন্ধু-বান্ধব ও পাড়া-পড়শীদেরও সাবধান করে দেবেন যাতে তাঁরা কেউ এ ধরনের তারের কাছাকাছি না যান—বিশেষ করে শিশুদের সামলে রাখুন।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

নতুন কিছু কবিতা
আর
নতুন কিছু গল্পের জন্য

কৃশানু

নতুন লেখকদের একমাত্র মুখপত্র

৩০/১-এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

কৃশানু

- 'কৃশানু' মুখ্যত নবীন লেখকদের মুখপত্র। কৃশানু'তে রচনা প্রকাশের জন্য তদ্বির করতে হয় না। উন্নত মানের যে কোন মৌলিক রচনা প্রকাশের জন্য সাদরে গৃহীত হবে।
- প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।
- প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা। এককালীন চাঁদা ছয় টাকা। সডাক আট টাকা। নমুনা সংখ্যার জন্য দুই টাকার ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।
- পাঁচজন গ্রাহক-সংগ্রহকারী, এক বছরের কাগজ বিনামূল্যে পাবেন। পাঁচ কপির কম এজেন্সী দেওয়া হয় না। এজেন্টরা ২০% কমিশন পাবেন।
- যাদের গ্রাহক-চাঁদা শেষ হয়েছে, তারা গ্রাহক-চাঁদা পাঠান।
- যোগাযোগ: কৃশানু, ৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন

শারদীয় উৎসবের আনন্দমুখর দিনগুলিতে সর্বত্র সংযম ও শৃঙ্খলা রক্ষা করুন। আপনার আনন্দের আতিশয্য যেন অন্যের অসুবিধার কারণ না হয়।

উৎসবের সময় অর্থ ও বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করুন। চাঁদা আদায়ের নামে যাঁরা জনগণের ওপর জুলুম করেন, পথচারী ও যানবাহন সমস্যার কথা না ভেবে যাঁরা পথের ওপর উৎসব আয়োজন করেন, মাইক্রোফোনের অত্যাচারে যাঁরা জনজীবনকে বিপর্যস্ত করেন তাঁদের সংযমী আচরণে উদ্দীপিত করা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাজ। উৎসবের উদ্দেশ্য কোনো মানুষকে বিব্রত করা নয়, সকলের মধ্যে প্রীতির বিনিময় করা।

আমাদের ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে বহু ধর্ম ও সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি অবস্থান। কোনো এক সাধারণ উৎসব তাই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে আরও দৃঢ় ও প্রসারিত করার সুযোগ এনে দেয়। কোনো অবস্থাতেই পারস্পরিক সম্প্রীতি যেন ক্ষুণ্ণ না হয়।

যুবসম্প্রদায় তথা রাজ্যের সকল মানুষের কাছে আমার আবেদন, শারদীয় উৎসব পালনের সময় সংযম ও সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ রাখুন। অন্যের অসুবিধা না করে উৎসব উদ্‌যাপন করুন।

আই. সি. এ. ৯৩৪৫। ৭৯

আমাদের সংস্কৃতি
সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মধ্য দিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম শহরের মানুষ আজ এক ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হয়ে ন্যায্য দাবি আদায় ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করে চলেছেন।

কিন্তু জনসাধারণের শত্রুরা মরিয়া হয়ে জনগণের এই সংগ্রামী ঐক্য নষ্ট করে দিতে চাইছে।

তারা চাইছে ধর্মের নামে বাঙ্গালীয়ানার নামে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে ভাঙন ধরাতে।

এ দেশ রবীন্দ্রনাথের, নজরুলের। এ রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের মানুষ সুখে-দুঃখে, আনন্দে-বেদনায়, সংগ্রামে-আন্দোলনে একে অন্যের সাথী ও অংশীদার। এখানে স্থান নেই কোন ক্ষুদ্র সংকীর্ণতার। স্থান নেই, মূঢ় ধর্মান্ধতার কিংবা কোন কুটিল ভেদবুদ্ধির।

সংগ্রামী জনগণ ধর্ম বা প্রাদেশিকতার ভেদাভেদ জানে না, মানে না।

বিচ্ছিন্নতাবাদী চরম প্রতিক্রিয়ার অশুভ শক্তিগুলিকে নিষ্ক্রিয় করুন।

সব রকমের প্ররোচনা ও চক্রান্তকে পরাস্ত করুন।
পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ও সম্প্রীতি রক্ষা করুন।

সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা জনসাধারণের শত্রু।

আই. সি. এ. ৯৩৪৪। ৭৯

কৃশানু / শারদীয় ১৩৮৬

P29402

কৃশানু

ত্রৈমাসিক সাহিত্য পত্রিকা

দ্বাদশ বর্ষ। প্রথম সংখ্যা।

শ্রাবণ—আশ্বিন ১৩৮৬

লেখক সূচি

সম্পাদকীয়।

প্রবন্ধ

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় / ১

কবিতা

প্রথম গুচ্ছ—শুদ্ধসত্ত্ব বসু / কৃষ্ণ ধর / সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় / গৌরাঙ্গ ভৌমিক / প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত / সাধনা মুখোপাধ্যায় / গোবিন্দ ভট্টাচার্য্য / রথীন কর / ঈশ্বর ত্রিপাঠী / কার্তিক মোদক / রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় / কেদার ভাদুড়ি / মীনা ভৌমিক / দাউদ হায়দার / জীবেশ বন্দ্যোপাধ্যায় / দীপক জানা—
১১—২৪

দ্বিতীয় গুচ্ছ—শান্ত রায় / শ্যামলকান্তি দাশ / হৃষীকেশ বিশ্বাস / অজিত বাইরী / প্রণব পাল / মথুর দাস / বিজয়কুমার ভট্টাচার্য্য / মলয় সিংহ / অনুপকুমার আচার্য / কাশীনাথ দাশ চাকলাদার / পিনাকেশ সরকার / কালোধন মুখোপাধ্যায় / মাহমুদ কামাল / রাজ রায় / গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় / সলিল চক্রবর্তী / শক্তি মুখোপাধ্যায় / দেবাশিস প্রধান ৮১—৯০

গল্প

রতেশ্বর বর্মণ / পিনাকীরঞ্জন গুহ / অমিয় চৌধুরী / কিরণচন্দ্র মৈত্র / কানাই কুণ্ডু / নীতীশ বসু / বিজনকুমার ঘোষ / জ্যোৎস্নাময় বসু / মদন দাশ—
২৫—৭৬ এবং ৯১—১১২

প্রচ্ছদ
শ্রীপ্রভাস

সম্পাদক
দীনেশচন্দ্র সিংহ

সম্পাদকীয়

কৃশাঙ্গ পত্রে বৎসরে পদার্পণ করল। কিন্তু বড় কষ্টকর এই পদযাত্রা। প্রতি মুহূর্তে যাত্রাভঙ্গের আশঙ্কা। এই আশঙ্কাই জেগেছিল তেইশ বৎসরাধিক পূর্বে রোগশয্যায় শায়িত কথাশিল্পী মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে। ইসলামিয়া হাসপাতালে সাহিত্যিক ভবানী মুখোপাধ্যায় ও অধুনালুপ্ত 'নতুন সাহিত্য' পত্রিকার সম্পাদক অনিল সিংহের কাছে লিটল ম্যাগাজিনের সমস্যা ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি যা বলেছেন—"৫৫৫ মাণিক সেই রোগশয্যায় শুয়ে···মূলধনহীন অল্পপুঁজির সাহিত্য পত্রের সমস্যা নিয়ে অনেক কথা বললেন। বললেন যে, এই পত্রিকাকে যদি না বাঁচানো যায়, তা হলে বাংলা সাহিত্য তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হারাবে, সাহিত্য পুঁজিবাদী মালিকের কথামত রচিত হবে এবং সাহিত্যিকের মানসিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হবে।" (নতুন সাহিত্য—১৩৬৩)

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশঙ্কা যে বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত হয়েছে তা কারো অজানা নয়। লিটল ম্যাগাজিন বলতে আর বেশী বাকী নেই। ওদিকে 'বিগ বিজনেস' পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত "গ্রুপ অফ্ পেপার্স" থেকে শিশু-সিনেমা-খেলাধূলা-রাজনৈতিক-নান্দনিক-কৃষিবাণিজ্যিক দৈনিক সাপ্তাহিক-পাক্ষিক পত্রপত্রিকা অবিরাম জন্ম নিচ্ছে। মালিকের নির্দেশে রচিত সেসব পত্রপত্রিকার উচ্চ বেতনভুক সাহিত্যিকের মানসিক স্বাধীনতা কতটুকু তা পাতা ওল্টালেই চোখে পড়ে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিমবঙ্গের তথ্য ও জনসংযোগ মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমরা একটি আবেদন রাখছি। তাঁর দপ্তর মানোত্তীর্ণ লিটল ম্যাগাজিনগুলির প্রতি সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচশত কপি ক্রয় করে পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন সরকারী ও সাধারণ পুস্তকাগার ও পাঠাগারে বিলি করার পরিকল্পনা নিতে পারে। তাহলে অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে লড়াই'র অন্যতম হাতিয়ার লিটল ম্যাগাজিন-গুলি বেঁচে যাবে। নতুন ও উদীয়মান প্রতিভার স্ফুরণ ও অনুশীলনের পথও খোলা থাকবে। এস্টাব্লিসমেন্টের হুকুমদারীর বিরুদ্ধে দুর্বল হলেও একটা সরব প্রতিদ্বন্দ্বী ও প্রতিযোগীর অস্তিত্ব রক্ষা পাবে।

এইচ এম ভি'র পূজার নতুন রেকর্ড

(প্রথম স্তবক)

লং প্লে রেকর্ড

আধুনিক

হেমন্ত মুখোপাধ্যায়
(স্টিরিও)
'এ লিজেণ্ড অফ মোরি'—খণ্ড ২
সলিল চৌধুরীর সুরে 'রাণার', 'গাঁয়ের বধূ', 'পাল্কীর গান', 'অবাক পৃথিবী' ইত্যাদি নয়টি অবিস্মরণীয় গানের এক অসাধারণ সংকলন।

কিশোরকুমার
'নয়ন সরসী কেন ভরেছে জলে'
—এই গানটি এবং শিল্পীর আরো এগারোটি সর্বকালের প্রিয় বাংলা আধুনিক গানের এক অনবদ্য সংকলন।

ফিরোজা বেগম
(স্টিরিও)
'স্মৃতির মালিকা গাঁথি'
পুণব রায়ের কথায় ও পকমল দাশগুপ্তের সুরে 'তুমি কি এখন দেখিছ স্বপন', 'মোর জীবনের দুটি রাতি', 'আমি বনফুল গো', 'মাটির এ খেলা ঘরে' ও আরো ৮টি মর্মস্পর্শী আধুনিক গানের নতুন সংকলন।

যন্ত্রসঙ্গীত (স্টিরিও)
ওয়াই এস মুলকী
'রেমিনিসেন্সেস্'
পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানে ১২টি প্রভূত জনপ্রিয় হিন্দি চিত্রগীতির সুর।

সুপার সেভেন রেকর্ড
(স্টিরিও)
বাউল সঙ্গীত
পূর্ণদাস বাউল

এল পি ৪৫ রেকর্ড
(স্টিরিও)
কণা লায়লা
'বাবা এগেন'
৮টি মনমাতানো গানের এক অবিস্মরণীয় নতুন রেকর্ড—শিল্পীর স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছলতায় ভরপুর।

ই পি রেকর্ড
আধুনিক (স্টিরিও)
শ্যামল মিত্র,
প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মিন্টু ভট্টাচার্য, বনশ্রী সেনগুপ্ত,
সুধীন সরকার,
শ্রাবন্তী মজুমদার

রাগপ্রধান গান
(স্টিরিও)
গীতশ্রী
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়

পল্লীগীতি (স্টিরিও)
দময়ন্তী বর্মণ (রাজ)
গঙ্গাচরণ বিশ্বাস

কৌতুক গীতি (স্টিরিও)
মিন্টু দাশগুপ্ত

কৌতুক নক্সা
সুশীল চক্রবর্তী এবং অন্যান্য

আপনার কাছাকাছি এইচ এম ভি ডিলারের দোকানে খোঁজ করুন—আজই।

প্রতি রবিবার কলকাতা বিবিধভারতী কেন্দ্রে রাত ৯॥০ টায় 'এইচ এম ভি সঙ্গীতাঞ্জলি' অনুষ্ঠানে পূজার নতুন গান শুনুন।

হিজ মাস্টার্স ভয়েস

সৌন্দর্য ব্যাখ্যায় কীট্‌স্ ও রবীন্দ্রনাথ

বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের প্রিয় বিদেশী কবিদের তালিকায় কীট্‌স একটি উল্লেখযোগ্য নাম। কীট্‌সের প্রতি কবির প্রীতির প্রমাণ স্বরূপ একাধিক প্রসঙ্গে উদ্ধৃত কীট্‌সের—'Ode on a Grecian Urn' কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি প্রথমেই স্মরণীয়। এই পঙ্‌ক্তিগুলি হচ্ছে 'Thou silent form, dost tease us out of thought/As doth eternity এবং Beauty is truth, truth beauty', যদিও [শেষোক্ত উক্তিটি রবীন্দ্রনাথের লেখায় অধিকাংশ প্রবন্ধে রূপ পেয়েছে Truth is beaty, beauty truth. নিজের বক্তব্যের সমর্থনে পরের উক্তি কবি খুব কমই ব্যবহার করেছেন, তাই Keats-এর এই উক্তিগুলি বিশেষতঃ শেষোক্তটির অতি ব্যবহার নিঃসন্দেহে কৌতূহলোদ্দীপক। সৌন্দর্যতত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে পুনঃ পুনঃ Keatsকে স্মরণ করায় স্বভাবতঃই এই উভয় কবির সৌন্দর্য-চিন্তার স্বরূপ সাদৃশ্যের কথা মনে হতে পারে।

রবীন্দ্রনাথের সৌন্দর্যবোধ যে চিন্ময়-বিশ্বজনীনতায় অধিষ্ঠিত ছিল তা ইন্দ্রিয়তার অতীত। সেখানে কল্যাণবোধ বা মঙ্গল চিন্তা ও প্রাত্যক্ষিক সত্যের বাইরে উপলব্ধিগত সত্যের স্থান ছিল সুনির্দিষ্ট। কবি সত্য, সৌন্দর্য, মঙ্গল সব কিছুকেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত বলে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়াও ছিল 'সামঞ্জস্যের সুষমা' আর সুগভীর 'সংযম সাধনা' প্রভৃতি প্রসঙ্গ। 'কড়ি ও কোমল' কাব্যে প্রেয়সীর সুকোমল বাহুডোরে আবদ্ধ হয়ে স্তনাগ্র শিখরের পেলব স্পর্শের আমেজে আমোদিত হওয়ার সীমা-শাসন ত্যাগ করে কবি একদিন 'অনন্ত প্রেমে'র নৈর্ব্যক্তিক ভাবমাধুর্যে উন্নীত হয়েছিলেন। সৌন্দর্যের ক্ষেত্রে কলা কৈবল্য-বাদের স্বেচ্ছাচারিতা পরিত্যাগ করে সুস্থির ভাবের জগতে রবীন্দ্রনাথ যেদিন উপস্থিত হয়েছিলেন সেদিন প্রাচীন ভারতীয় কবির 'মেঘদূতে' সৃষ্ট সৌন্দর্য-জগৎ 'রবিহীন মণিদীপ্ত প্রাসাদের দেশ' কবিকে আকৃষ্ট করেছিল। কীট্‌স একদিন প্রেয়সীর যৌবনের নবনী-কোমল দুতের উপর মাথা রেখে নিশ্চিন্ত

বিশ্রাম কামনা করেছিলেন কিন্তু তার পরও বলেছেন 'And still she slept in azure lidded sleep. /In blanched linen, smooth and lavendered/ while he from forth the closet brought and a heap of candied apple, quince, and plum and gurad/with Jellies soother than the creamy curd,/And lucent syrops tinct with cinnamon ;/ Manna and dates in argosy transferred, From Fez ; and spiced dianties everyone/From silken Samarcand to cedared Lebanon. এই পংক্তিগুলি উদ্ধার করে সৌন্দর্য দর্শন শাস্ত্রকার George Sarnayana জানিয়েছেন —'Even the most sensuous of English poets in whom the love of beauty is supreme, can not keep along to the primal elements of beauty ; the higher light is inevitable for him.' মোট কথা আপাতভাবে একটি সাদৃশ্য উভয় কবির মধ্যে লক্ষ্য করা যায় ; তা হচ্ছে ইন্দ্রিয়নির্ভরতা ত্যাগ করে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্য অথবা নৈকট্যের শাসন ত্যাগ করে সুদূরের রোমান্টিক আকর্ষণে অগ্রসরতি। সৌন্দর্যের বাস্তব ভিত্তি উভয়েই ত্যাগ করেছেন, কিন্তু শ্রুত সঙ্গীত অপেক্ষা অশ্রুত রাগিণী উভয়কেই মোহিত করেছে। বাস্তবকে স্বীকার করেও এই যে অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যের অস্তিত্ব উপলব্ধিই মনে হয়, এখানেই সৌন্দর্যবোধের পূর্ণতা। সেদিন থেকে কীট্স ও রবীন্দ্রনাথ উভয়েই পূর্ণ।

সত্য, সুন্দর ও শিব বা মঙ্গলের পৃথক মূল্য বা দার্শনিক পরিভাষায় 'values' সম্পর্কে যদিও কীটস এবং রবীন্দ্রনাথ উভয়েই সচেতন তবুও এদের সাদৃশ্য চিন্তায় উভয়েই কালক্ষেপ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাধনা' থেকে বঙ্গদর্শন পর্ব পর্যন্ত এই তিন মূল্যবোধের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। চিত্রা কাব্যে কবি যে 'বিজয়িনী'র কাছে মদনের পরাজয় ঘোষণা করেছেন, উর্বশীর সঙ্গে তার পার্থক্য স্বরূপগত, যেহেতু উর্বশীর রূপে মাদকতা আছে ; আছে অস্থির বিজলীদীপ্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয় অসারকারী বিষাক্ত নিঃশ্বাস। 'উর্বশী' থেকে 'বিজয়িনী'তে উত্তরণের মধ্যে আছে সৌন্দর্যের ধ্বংসাত্মিকা প্রভাব থেকে মঙ্গলময় সৌন্দর্যের স্বর্ণ শিখরে উপস্থিতির সংকেত। 'বিজয়িনী'র সৌন্দর্যে চাঞ্চল্য নেই, ভোগবাসনা একেবারে স্তব্ধ।

'বিজয়িনী'র সৌন্দর্য মঙ্গলময়, কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' এবং 'শকুন্তলায়'

রবীন্দ্রনাথ এই বৈরাগ্য-সুন্দর আলোকোজ্জ্বল প্রেমের সন্ধান করেছিলেন, যেহেতু সেই প্রেমই সুন্দর এবং তাঁর মতে, কালিদাসের জীবনও এই শৈব প্রেমাদর্শে দীক্ষিত। প্রেম যেখানে সংযমের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেখানে সৌন্দর্যের স্বাভাবিক বিকাশ। কীট্‌সের ইন্দ্রিয়নির্ভর প্রেমবাসনা সেখানে পৌঁছয় না। রবীন্দ্রনাথের এই বোধ তাঁর কবি স্বভাবেই আমূল প্রতিষ্ঠিত এবং প্রাচীন কাব্য-সাহিত্যের বিশেষতঃ উপনিষদের প্রভাব এখানে সক্রিয়। প্রেমধারণায় কীট্‌স ও রবীন্দ্রনাথের এই পার্থক্য মূলগত হলেও শ্রীমতী ফেনীর (To Fanny) উদ্দেশ্যে লেখা সনেটটি অন্ততঃ এই বিশ্বাস সৃষ্টি করে যে, একটি স্তরে কীট্‌স প্রেয়সী অপেক্ষা প্রেমকে কিছু কম গুরুত্ব দেন নি। তাঁর সবাক প্রেয়সীর উষ্ণ সান্নিধ্যে কীট্‌স কামনা করেছেন যার আবির্ভাব শুধু রক্তমাংসের অস্তিত্বে সার্থক হবে না, সার্থক হবে সেই প্রেমে— Merciful love that tantalizes not. যদিও প্রেয়সীর অধরোষ্ঠের নিবিড় চুম্বন অথবা উষ্ণবক্ষ যুগলের স্পর্শ (warm, white, lucent million pleasured breast) সহ প্রেয়সী কবির কাছে কাম্য তবু এখানে বোধ হয় শেষ নয়, কারণ তার ঘোষণা হচ্ছে 'yourself your soul-inpity give me all/withhold no atom'satom or I die.' তবু নির্দ্বিধায় বলা যায় কীট্‌সের পক্ষে প্লাতোর দেহোত্তীর্ণ প্রেমবোধ উপস্থিত হওয়া সম্ভব হয় নি। আর রবীন্দ্রনাথকে উক্ত গ্রীক দার্শনিক কতখানি প্রভাবিত করেছিলেন সে বিষয়ে আলোচনার অবকাশ রেখে বলা যায় বরং এবিষয়ে কালিদাসের প্রভাব তাঁর উপর স্পষ্টতর। প্রেম সম্পর্কে কীটস ও রবীন্দ্রনাথের এই পার্থক্য সৌন্দর্য বিচারেও কিছু পার্থক্য সৃষ্টি করেছে। বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথের আলোচনায় সংযমের প্রসঙ্গ উত্থাপনে। সংযমের প্রসঙ্গ থেকে রবীন্দ্রনাথ মঙ্গলের প্রসঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন। বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত 'সৌন্দর্যবোধ' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। পঞ্চেন্দ্রিয়ের পরিমিত পরিতৃপ্তিতে যে সংযমের পরিচয় ফুটে ওঠে তাই শেষ পর্যন্ত মঙ্গলের হেতু হয়ে দাঁড়ায় এবং কবির মতে 'সৌন্দর্য সৃষ্টি দুর্বলতা হইতে, চঞ্চলতা হইতে অসংযম ঘটিতেছে, এটা যে একটা অত্যন্ত বিরুদ্ধ কথা'; যেহেতু কবি মনে করেন 'কলাবান গুণীরাও তপস্বী' সেখানে যথেচ্ছাচার চলিতে পারে না। সেখানে বিত্তের সাধন ও সংযম আছেই। অতএব সৌন্দর্যবোধকে পূর্ণভাবে লাভ করিতে হইলে চিত্তের শান্তি চাই; তাহা অসংযমের দ্বারা হইবার জো নাই।' এই সংযমই শেষ পর্যন্ত মঙ্গলের রাজত্বে আমাদের পৌঁছিয়ে দেয়। এই "সৌন্দর্য

মূর্তি মঙ্গলের পূর্ণ মূর্তি এবং মঙ্গলমূর্তিই সৌন্দর্যের পূর্ণ স্বরূপ।" তখনই বিষ্ণুর সঙ্গে লক্ষ্মীর যথার্থ মিলন সম্ভব। কীট্‌সও সৌন্দর্যের সঙ্গে মঙ্গলের একটি সম্পর্ক বা সাদৃশ্য সন্ধান করেছিলেন যেহেতু এই দুটি 'ভ্যালুজ'এ রয়েছে 'disinterested' বা নির্লিপ্ত মনের ক্রিয়া। দেখা যায় রাস্তায় ঝগড়া করার মত কুৎসিৎ ব্যাপারও লেখকের নিরাসক্ত বিবেকের কাছে কাব্যের বিষয়ীভূত হয়ে সৌন্দর্যের পদবী লাভ করে। মঙ্গলকর্মেও রয়েছে এই আসক্তিহীন চিত্তের ক্রিয়া, তাই বোধ হয় কীটস্ বলেছেন, "I am convinced more and more day by day that fine writing is next to fine doing, the top thing in the world." মঙ্গল-কর্ম বা শিল্পীর সাধন ক্রিয়া হিসেবে বা প্রয়োগের দিক থেকে পৃথক দিগন্তের বলেও কীট্‌স উভয় কর্মের ভিতর নির্লিপ্ত মানসিকতার যে প্রাধান্য লক্ষ্য করেছিলেন সেখানেই যেন তাঁরা সমস্তরের। ১৮১৮'র ২৪শে এপ্রিল বন্ধু Taylor-কে কবি একটি পত্রে জানাচ্ছেন 'I find there is no worthy pursuit but the idea of doing some good for the world—some do it with their society—some with their wit—some with their benevolence—some with a sort of power of conferring pleasure and good humour on all they meet and in a thousand ways all equally dutliful to the command of Great Nature—there is but one way for me the road lies through application study and thought' কীট্‌স জানেন 'Pleasure is never at home.' সুতরাং 'Let the Fancy roam'. পৃথিবীর সব রঙ মুছে যায় যখন ফুরায় লেন দেন, তখন একমাত্র কল্পনাই পারে মানুষকে আনন্দের স্বর্গে পৌঁছে দিতে। অতএব নিষ্প্রেম পৃথিবীর বিশুষ্ক তপ্ত নিঃশ্বাসের স্পর্শে ফুরিয়ে যাবার আগে কবি কীট্‌সকে 'Viewless wings of poesy'তে ভর করতে হয়েছে যদিও আবার মর্তজগতে হাজির হতে হয়েছে আহত চিত্তে। কিন্তু কল্পনা বা কবিতার নিশ্চিত কাম্য স্বর্গই কীটসকে চিরন্তন আশ্রয় দিতে পারেনি; তাই দর্শনের প্রতি একটি সুগভীর প্রীতি অনুভব করেছেন তিনি এবং উপলব্ধি করেছেন 'I find that I can have no enjoyment in the world but continual drinking knowledge,' কাব্য কবিতা অপেক্ষা দর্শনের প্রতি কোন অংশে কম স্পৃহা ছিল না কীটসের। দার্শনিক না হলেও দার্শনিক-শোভন জ্ঞান (knowledge) এবং নীতিশাস্ত্র (ethics)

সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার অভাব ছিল না তাঁর। তাই মঙ্গলবোধ ও কল্যাণ-চিন্তাকে অপ্রাসঙ্গিক জ্ঞানে মুছে ফেলতে পারেন নি। তবে মঙ্গলকর্মের যে পথের সন্ধান তিনি পেয়েছেন তা হচ্ছে 'through application study and thought.' কি তা হলে কীট্‌স চেয়েছিলেন কাব্য কবিতা রচনা করে জগতের মঙ্গল সাধন করতে? কিন্তু এ কথনই সত্য মনে হয় না যেহেতু তিনি বলেছেন, 'I take poetry to be chief.' কবিতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন, পৃথিবীর যাবতীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করেছেন এবং কল্যাণবোধকে স্থান দিয়েছেন সুনির্দিষ্ট ক্ষেত্রে। সব কিছুকে এই ভাবে স্বীকৃতি দেওয়া সত্ত্বেও সব কিছুকে মিলিয়ে একাকার করে ফেলেন নি। রবীন্দ্রনাথের কল্যাণ চিন্তা এই রকম কোন নির্দিষ্ট দার্শনিক তত্ত্বের সমর্থন লাভের জন্য উৎসুক ছিল না। ছিল সুগভীর জীবনরস বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রত্যয়-বলিষ্ঠ। মঙ্গল মূর্তিকে সৌন্দর্যের পূর্ণ মূর্তি রূপে গ্রহণ করার মধ্যে আমাদের বক্তব্যের সন্ধান মিলবে নিশ্চয়ই। রবীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যানুসারে শকুন্তলার প্রথম অঙ্কের মিলন সপ্তম অঙ্কের ভাবসম্মিলনে যেখানে পূর্ণতা ও সৌন্দর্য লাভ করেছে সেখানে এবং যেখানে মেঘদূতের মেঘ, নদ, নদী নগরীর তৃষ্ণা হরণ করে স্নিগ্ধ ও পূর্ণ করে চলেছে সেখানে সৌন্দর্য মূর্তি ও মঙ্গল মূর্তি অভিন্নতা লাভ করেছে।

সৌন্দর্য ও মঙ্গলের সম্পর্ক চিন্তায় কীট্‌স ও রবীন্দ্রনাথের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া গেলেও উভয়ের আন্তরিক মিল যদি কোথাও থাকে, তা হচ্ছে সত্য ও সৌন্দর্যের অভিন্নত্ব বোধে। কীট্‌স্ তাঁর Grecian Urn-এর উপর লিখিত কবিতার পঞ্চম স্তবকের একেবারে শেষে বলিষ্ঠ কণ্ঠে যেন চরম সত্যের নির্দেশ দিয়ে বললেন "Beauty is truth, truth beauty—that is all/ye know on earth, and all ye need to know. এই উক্তির বছর দুই আগে—Endymion (১৮১৮)-এর প্রথমেই—'A thing of beauty is a joy for ever' সুন্দর বস্তু চিরকাল আনন্দ দান করে—এই প্রবাদপ্রতিম বাক্যে কীট্‌স্ যে সত্য জানিয়েছিলেন Grecian Urn এর শেষ দুটি পংক্তিতে যেন সেই সত্যের চরম উপলব্ধি এ দুটি উক্তি থেকে সৌন্দর্য, সত্য ও আনন্দের সম্পর্ক বিষয়ে কীট্‌সের বক্তব্য মোটামুটি একরকম দাঁড়ায়—সুন্দরবস্তু চিরকালের আনন্দের সামগ্রী এবং সৌন্দর্যই সত্য; সত্যই সৌন্দর্য;—এই হচ্ছে সার কথা। সৌন্দর্যই আনন্দ দান করে, যেহেতু ইন্দ্রিয়ের জগত থেকে অতীন্দ্রিয় শাশ্বত ভাবজগতে সৌন্দর্য আমাদের পৌঁছিয়ে দেয়, পঞ্চেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য সুন্দর আমাদের তাৎক্ষণিক আনন্দ দান করে।

কিন্তু সৌন্দর্যের অনুভূতি এক সময় অসীমের উৎসমুখ খুলে দিয়ে হৃদয়কে কানায় কানায় ভরিয়ে তোলে। জাগতিক সীমিত সৌন্দর্যে মানুষ কোন আশ্রয় পায় না। ক্লান্তি বিষণ্ণতা জড়িয়ে সেই সৌন্দর্য খণ্ড ক্ষুদ্র, ভগ্ন ক্ষণস্থায়ী। এই ক্ষণস্থায়িত্বের বেদনা কীট্‌সের অন্তরে যদি অসীম শাশ্বতের আর্তি জাগিয়ে না তুলত তাহলে Grecian Urn এবং উপরকার কতকগুলি স্থবির মূর্তি তাকে ভাবাত না—'Thou Silent form, dost tease us out of thought/As doth eternity" অথবা শ্রুত সঙ্গীত অপেক্ষা অশ্রুত রাগিণীর জন্য তাঁর অন্তর ব্যাকুল হত না। সুতরাং কীট্‌স্ সৌন্দর্যকে ইন্দ্রিয়ের উর্দ্ধে স্থাপন করে তারপর সেই সৌন্দর্যকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিলেন। আবার এই সত্যের উপলব্ধিই আনন্দময়। রবীন্দ্রনাথ সৌন্দর্যের ভিতর সত্য ও আনন্দের সন্ধান করেছিলেন। তাঁর মতে দ্বন্দ্বোত্তীর্ণ অবস্থায় যখন মঙ্গল ও অমঙ্গলের ভেদ নষ্ট হয়ে যায়, সুখ ও অসুখের পার্থক্য থাকে না তখনই 'সমস্তই সুন্দর, তখন সত্য ও সুন্দর একই কথা হইয়া ওঠে। তখনই বুঝিতে পারি, সত্যের যথার্থ উপলব্ধিই আনন্দ, তাহাই চরম সৌন্দর্য।' অর্থাৎ কীট্‌সের মত রবীন্দ্রনাথও সুন্দর ও সত্যের অভিন্নত্বের মধ্যে আনন্দের সন্ধান করেছিলেন। তাঁর মতে, যেখানে দ্বন্দ্ব নাই, সেখানেই সত্য ও আনন্দের উপলব্ধি অভিন্ন। "যেখানে আমাদের কাছে সত্যের উপলব্ধি সেইখানেই আমরা আনন্দকে দেখিতে পাই। সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিই আনন্দের অভাব। কোন সত্যে যেখানে আমাদের আনন্দ নাই সেখানে আমরা সত্যকে জানি মাত্র। তাহাকে পাই না। যে সত্য আমাদের কাছে নিরতিশয় সত্য তাহাতেই আমার প্রেম। তাহাতেই আমার আনন্দ। এইরূপে বুঝিলে সত্যের অনুভূতি ও সৌন্দর্যের অনুভূতি এক হইয়া দাঁড়ায়।" সত্য ও সৌন্দর্যের এই সাদৃশ্য ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার কীট্‌সকে স্মরণ করেছেন। "Ode on a Grecian Urn কবিতার পঞ্চম স্তবকের একেবারে শেষে কীট্‌স বলেছেন "Beauty is truth, truth beauty." Beauty বা সৌন্দর্যের কোন সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব না। কীট্‌সও সে চেষ্টা করেন নি, তবে একাধিকবার পত্রে 'truth' কথাটির ব্যাখ্যার চেষ্টা করেছেন। ১৮১৭'র ২২শে নভেম্বর Bailey-র কাছে লেখা একটি পত্রে জানাচ্ছেন - "What imagination seizes as beauty must be truth whether it existed before or not." এরপর ১৮১৮-এর নভেম্বরে George ও Georgiana Keats এর কাছে লিখছেন "I never can feel certain of any

truth but from a clear perception of its beauty." কল্পনার জগতে যে বস্তু সুন্দররূপে গৃহীত তাই সত্য; বাস্তবে তার অস্তিত্ব না থাকলেও, এবং সৌন্দর্যের উপলব্ধি থেকেই সত্যবোধ উপস্থিত হওয়া সম্ভব, সাধারণভাবে এই হচ্ছে কীট্সের অভিমত। সুতরাং কীট্স যাকে সত্য বলেছেন তা, হচ্ছে Poetic truth বা কাব্যিক সত্য। জাগতিক সত্য প্রাত্যক্ষিক সত্য, প্রমাণ প্রয়োগের উপর নির্ভরশীল আর কাব্যিক সত্যের সৌন্দর্য একান্তই অনুভূতিগম্য বিষয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ইন্দ্রিয়নির্ভর "সত্য" ও ইন্দ্রিয়াতীত অনুভূতি 'সৌন্দর্য' পরস্পর সাপেক্ষ বা অভিন্ন হয় কি করে? কীট্স নিজেও এ বিষয়ে অচেতন ছিলেন না। যে সত্য প্রত্যক্ষগম্য তাই তাঁর কাছে সুন্দর ও ঐকান্তিক হলে কখনই 'Heard melodies are Sweet, but those unheard/are sweeter-এ ধরণের উক্তি করতেন না। কীট্স সৌন্দর্যকে সর্বোচ্চে বসিয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু এই সৌন্দর্য যখন কল্পনার দ্বারা গ্রাহ্য হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষতার দ্বারা সীমাবদ্ধ না হয় তখনই তা তার কাছে সত্যরূপে গণ্য হয়েছে। মোট কথা, 'Beauty' এবং 'Truth' দুটি বোধই ইন্দ্রিয়তার উর্দ্ধে। কীট্সের মন্তব্যটি "Beauty is truth, truth beauty—that is all ye know on earth, and all ye need to know!" উদ্দিষ্ট হয়েছে পাঠকের দিকে, যদিও সমগ্র কবিতার অন্যান্য অংশে Grecian Urn-ই কবির লক্ষ্য। যেন Urn-এর উপর অঙ্কিত চিত্র সমূহ থেকে কীট্স এই সত্যে পৌছেছেন—সৌন্দর্যই যে সত্য তা সকলের জানা উচিত। বাস্তব জগতের সৌন্দর্য ভগ্ন বা খণ্ড বলে তা সত্য নয়, কিন্তু শিল্পের সৌন্দর্য অখণ্ড বা এক। সৌন্দর্যই যে সত্য এ উপলব্ধি কবির সম্ভব হয়েছে শিল্পবস্তু থেকে। অতএব এ কথা ভাবা যেতে পারে যে কীট্সের মতে শৈল্পিক সৌন্দর্যই নিত্য বস্তু এবং চিরন্তন সত্য। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি রবীন্দ্রনাথ সত্য ও সৌন্দর্যের প্রসঙ্গে কীট্সের "Thou Silent form · " এবং 'Truth is beauty, beauty truth' উক্তি দুটি একাধিকবার স্মরণ করেছেন। তাঁর Creative Unity প্রবন্ধে এবং ১৩৩১-র বঙ্গবাণীতে প্রকাশিত "তথ্য ও সত্য" প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ "Thou Silent form · · ' ইত্যাদি পঙক্তিদুটি উদ্ধার করেছেন। শেষোক্ত প্রবন্ধে লিখেছেন - "কীট্স তাঁর কবিতায় নিখিল একের সঙ্গে গ্রীক পাত্রটির ঐক্যের কথা জানিয়েছেন · · । অখণ্ড একের মূর্তি যে আকারেই থাক না, অসমকেই প্রকাশ করে, এই জন্যই সে অনির্বচনীয়। মন এবং বাক্য তার কিনারা না পেয়ে ফিরে ফিরে আসে।" কীটসের পঙক্তি দুটির ভেতর

থেকে এই সত্যের সন্ধান পেলেন - সৌন্দর্য ও রস রয়েছে ঐক্যের ভিতর। কাব্যে চিত্রে, গীতে, আমরা পরিপূর্ণ একককে চরমরূপে দেখি এবং আমাদের অন্তরাত্মার একের সঙ্গে বহির্লোকের একের মিলন হয়। রবীন্দ্রনাথ নিজে তাঁর Creative Unity গ্রন্থের "The poets Religion" প্রবন্ধে লিখেছেন "The Joy of Unity within Ourselves, Seeking expression, becomes creative, whereas our desire for the fulfilment of our needs is constructive." ঐক্যের আনন্দ সৃষ্টির মধ্যে প্রকাশ, আর প্রাপ্তির মধ্যে বৃহৎ জগদ্ব্যাপারের সঙ্গে অন্তরের মিলনের ফলে অখণ্ড একের সার্থক প্রকাশ হয়। যেখানে এই ঐক্যের বিনাশ ও প্রয়োজন সাধনের চেষ্টা হয়, সেখানে সত্য লাভও হয় না। "নিখিলকে ছিন্ন করে হয় লাভ, নিখিলকে এক করে হয় রস।" আর "সাহিত্যে ও আর্টে কোন বস্তু যে সত্য তার প্রমাণ হয় রসের ভূমিকায়। রবীন্দ্রনাথের কাছে এইভাবে ঐক্য, রস, সত্য পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়ে পড়েছে; কীট্‌সের উক্তির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ এই ধারণার প্রকাশ পেতে দেখেছিলেন। তাই বোধ হয় তথ্য ও সত্যের সম্পর্ক বা প্রাত্যহিক ঘটনা ও সাহিত্যের সত্যের সম্বন্ধ আলোচনা করতে গিয়ে কীট্‌সের উক্তিটি মনে পড়েছে তাঁর।

বৃহৎ জগদ্ব্যাপার ও শিল্পের জগতে একটি সুগভীর ঐক্যের সুষমা বা Unity বর্তমান – রবীন্দ্রনাথ এই বিশ্বাস তাঁর লেখায় একাধিকবার প্রকাশ করেছেন। আবার এই ঐক্য ও সত্য বা Truth তাঁর কাছে একার্থক। পুনশ্চ, সেখানে এই ঐক্য সুষমামণ্ডিত হয়েছিল সেখানে সৌন্দর্যেরও সহজ প্রকাশ। অতএব সৌন্দর্য ও সত্যের মধ্যে আছে ঐক্যের একটি সাধারণ সূত্র। পূর্বেই বলা হয়েছে, কীটসের ব্যাখ্যানুযায়ী সত্য হচ্ছে বস্তুনিরপেক্ষ ও কল্পনা নির্ভর। কল্পনা যাকে সুন্দর বলে গ্রহণ করেছে, তাই সত্য। অতএব কীটসের কাছে সত্যের আগে সৌন্দর্যের স্থান এবং সুন্দর বস্তুই সত্যবস্তু তা তথাকথিত অবাস্তব ও কাল্পনিক হলেও। আমরা প্রথমেই বলেছি রবীন্দ্রনাথ কীটসের "Beauty is truth, truth beauty' উক্তিটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আংশিক ও কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে গ্রহণ করেছেন। ১৩১৩'র পৌষ সংখ্যার বঙ্গ দর্শনের "সৌন্দর্যবোধ" প্রবন্ধে কবি লিখেছেন, "আধুনিক কবি বলিয়াছেন : Truth is beauty, beauty truth আমাদের শুভ্রবসনা কমলাসন দেবী সরস্বতী একাধারে Truth এবং beauty মূর্তিমতি। উপনিষদও বলিতেছে : আনন্দরূপমমৃতং যদ্ বিভাতি, যাহা কিছু প্রকাশ পাইতেছে

সমস্তই আনন্দরূপমমৃতং। এবং সত্য যে কার্য কারণ পরম্পরা, সেকথা জানাইবার অন্য শাস্ত্র আছে। কিন্তু সাহিত্য জানাইতেছে, "সত্যই আনন্দ, সত্যই অমৃত।" এরপর ৩২২ জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার সবুজপত্রের "কবির কৈফিয়ৎ" প্রবন্ধের একেবারে শেষাংশে- "কবির ছন্দে এই মন্ত্রের উচ্চারণ শেষ হইবে না : Truth is beauty, beauty truth ইহাতে আপিস আদালত কলেজে লাঠি হাতে তাড়া করিয়া আসিলেও সকল কোলাহলের উপরেও এই সুর বাজিবে—সমুদ্রের সঙ্গে, অরণ্যের সঙ্গে, আকাশের আলোক বীণার সঙ্গে সুর মিলাইয়া বাজিবে—"আনন্দং সম্প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি" যাহা কিছু সমস্তই পরিপূর্ণ আনন্দের দিকেই চলিয়াছে, ধুঁকিতে ধুঁকিতে রাস্তার ধুলার উপর মুখ থুবড়াইয়া মরিবার দিকে নহে।" ১৩৪৩'র ৮ই আশ্বিন শান্তিনিকেতন, তারিখে অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে লিখছেন—"কীটসের বাণী মনে পড়ল : Truth is beauty, beauty truth অর্থাৎ যে সত্যকে আমরা "হৃদ, মনীষা" উপলব্ধি করি তাই সুন্দর তাতেই আমরা আপনাকে পাই। এই কথাই যাজ্ঞবল্ক্য বলেছেন যে, যে কোন জিনিস আমার প্রিয় তার মধ্যে আমি আপনাকেই সত্য করে পাই বলেই তা প্রিয়, তাই সুন্দর।"

এরপরও দুই একটি প্রসঙ্গে ('সাহিত্যের স্বরূপ' প্রবন্ধে) কীটসকে আংশিক স্মরণ করেছেন কবি। বিভিন্ন প্রসঙ্গে কীটসের উদ্ধৃত উক্তিটি রবীন্দ্রনাথ উদ্ধার করেছেন এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিপরীতভাবে। এতে রবীন্দ্রনাথের অজ্ঞানতা প্রমাণ হয় না বরং মনে হয় পরিবর্তন কিছুটা উদ্দেশ্য বিশিষ্ট এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তব্যও বোধ হয় কীটসের থেকে পৃথক। উপরের তিনটি উক্তি লক্ষ্য করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কীটসকে উল্লেখ ক'রে উপনিষদের উল্লেখ করেছেন। প্রথম দুটি উক্তিতে Truth, beauty ইত্যাদি ব্যাখ্যায় উপনিষদের "আনন্দ" "অমৃত" কথা দুটি ব্যবহার করেছেন। কবির মতে "সত্যই আনন্দ। সত্যের উপলব্ধিতে ভাল-মন্দ সুখদুঃখের—কোন দ্বন্দ্ব নেই। সত্যের যথার্থ উপলব্ধি মাত্রই আনন্দ। তাহাই চরম সৌন্দর্য। সত্যের অসম্পূর্ণ উপলব্ধিই আনন্দের অভাব। কোন সত্যে সেখানে আমাদের আনন্দ নেই। সেখানে আমরা সেই সত্যকে জানি মাত্র, তাহাকে পাই না। সে সত্য আমাদের কাছে নিরতিশয় সত্য তাহাতেই আমাদের প্রেম, তাহাতেই আমাদের আনন্দ। এইরূপে বুঝিলে "সত্যের অনুভূতি" ও "সৌন্দর্যের অনুভূতি" এক হইয়া দাঁড়ায় (সৌন্দর্য বোধ : বঙ্গদর্শন) সত্য ও আনন্দের উপলব্ধি একই, যেহেতু দুটি ক্ষেত্রেই আমার নিজেদের

বিশেষ ভাবে পাই। আবার সত্যে নিজেকে বিশেষভাবে পাই বলে সত্যই সুন্দর। এখানে সত্য কথাটি নিঃসন্দেহে বিশিষ্টার্থে প্রযুক্ত। এই সত্য প্রাত্যহিক বা প্রাত্যক্ষিকে facts মাত্র নয়, একান্তই উপলব্ধিগত বা হৃদয়বেদ্য। কীট্‌সও যে truth-এর কথা বলেছেন তা শৈল্পিক। জাগতিক সত্য ভগ্ন বা খণ্ড বলে বা ঐক্যহীন বলে সুন্দরও নয়। অতএব সত্য ও সুন্দরের ঐক্য কল্পনায় রবীন্দ্রনাথ এবং কীটস উভয়েই ঐক্যে বা অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী এবং এখানেই উভয়ের গভীর সাদৃশ্য। কিন্তু উদ্দেশ্যের দিক থেকে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের যাত্রাপথে কিছু পার্থক্য আছে মনে হয়। আমরা দেখেছি, কীট্‌সও কবিতায় ও পত্রে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন beauty বা সৌন্দর্যের উপর এবং যা সুন্দর তাই সত্য তাঁর কাছে। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, যা সত্য তাই সুন্দর। কীটসের কাছে প্রথমে সুন্দর পরে সত্যের স্থান, আর রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রথমে সত্য পরে সুন্দর। Grecian Urn-এর উপর অঙ্কিত চিত্রগুলি যেহেতু সুবৃহৎ ঐক্যের সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি করে দিচ্ছে এবং সেগুলি জাগতিক অপূর্ণতার ঊর্ধ্বে তাই তারা কীটসের কাছে সুন্দর, এবং অতএব সত্য। অপরপক্ষে "হৃদা মনীষা মনসা" সত্যকে আমরা উপলব্ধি করি বলে সত্য ও সুন্দর অভিন্ন বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করেন সত্য ও সুন্দরের আপেক্ষিক গুরুত্ব উভয় কবির কাছে নিঃসন্দেহে পৃথক নতুবা নান্দনিক অর্থে সত্য ও সুন্দরের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্বীকারে উভয়েই একমত।

———

কবিতাগুচ্ছ

প্রপঞ্চময়

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

বাইরে থেকে সব সময়ই
ডাকছে কেউ না কেউ,
কেউ লাগারই মতো মনের গহনে
কার সতত আহ্বান—
ঘর ছেড়ে চলে যেতে কোথাও-না-কোথাও !
[হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোন্‌খানে]

অথচ জপের মালা নিয়ে বসে
ইষ্ট নামের স্মরণে সততই মনে পড়ে —
পুঁইয়ের চারাটা বুঝি ছাগলে মুড়োচ্ছে !
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালতে হবে বলে
সকালে তাই সলতে পাকাই !
ঘরের মায়া ত্যাগ করার ব্রত নিয়েই
দোর গোড়ায় পা বাড়াই—তবে উল্টো মুখে,
বাইরের ধুলো ঝড়ে চোখ যেন না ধাঁধায় !
কেমন যেন আদর কাড়ে ঘরের মায়া,
তা কি ভোলা যায় ?

কলকাতা কবিতা হয়ে যায়

কৃষ্ণ ধর

কলকাতা আমার কাছে কবিতার উপমা হয়ে যায়
বুকে তার যন্ত্রণার পুরনো ক্ষত
অবিরল রক্ত ঝরে যায়।
কখনো সে রাগী মোষ
বাধার দেয়ালে মাথা কোটে
কখনো আহত বাঘিনী যেন
চোখে তার বিদ্যুৎ ফোটে।
তার রাত্রি তার দিন
কলকাতার রাগ ঘৃণা প্রেম
হৃদয়ের অন্তর্গত কবিতার উপমা হয়ে যায়।

সুধা ভ্রমে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কেউ কেউ ভালোবাসে ভুল করে, কেউ কেউ ভালোই বাসে না।
কেউ কেউ চতুরতা দিয়ে খায় পৃথিবীকে, কেউ কেউ বেলা যায়
ফিরেও আসে না !

ওপরে চাঁদের কাছে মেঘ জমে, পাহাড়ের মেষতৃণে আগুন লেগেছে
যাদের বাঁচার কথা ছিল, নেই, ভুল মানুষেরা আছে বেঁচে।
স্বপ্ন বারবার ভাঙে, তবু কের স্বপ্ন উপাদান দেয়, অচেনা নারীরা
তাদের গলায় দোলে রক্তমাখা অত্যুজ্জ্বল ধাতুমালা, হীরে কিংবা হীরা !
আমার যা ভালোবাসা, কাঙালের ভালোবাসা, তার কোনো
মূল্য আছে নাকি ?

এ যেন জলের ঝারি, কেউ ফিরে আসবে বলে হঠাৎ মিলিয়ে যায়
বাবলা কাঁটার ঝোপে যেমন জোনাকি।

সুধা ভ্রমে বিষ খাই, বিষ এত মিষ্টি বুঝি ? তবে কেন সকলে
বলে লোনা ?

আমাকে মৃত্যুর হাতে ফেলে ওরা চলে যায় বারবার, ওরা মানে কারা ?
কই, কেউ তো ছিল না !

শোক বহুবার

গৌরাঙ্গ ভৌমিক

শোক তাকে ছুঁয়েছিল প্রথম যৌবনে, গোপনে গোপনে।
সে তাকে প্রকাশ্যে টেনে এনেছিল রাস্তার ওপর।
তারপর,
গোঁয়ারের মতো তার ঝুঁটি ধরে বলেছিল সে,
'কোথায় থাকিস তুই, কোন্‌খানে,
বল্‌ তোর রাস্তা আর বাড়ির নম্বর।'
বলেনি সে কিছুই বলেনি,
অদূরে নীরবে বসে অবিরল দিয়েছে হাতছানি,
'এই ছাখ এইখানে, ঐ ছাখ ঐখানে আমি।'
তারপর, শোক সে পেয়েছে বহুবার।
আবারও যে পাবে তার আভাস এসেছে কাছ থেকে,
শোকের নির্মূল চেয়ে বানিয়েছে সে বিশাল সোনালি কুঠার।
আবারও সে জানতে চায় আজ, 'কোথায় থাকিস তুই, কোন্‌খানে ?
বল তোর কোনখানে ঘর ?'
এবং উত্তর পাস, 'যেখানে থাকিস তুই সেইখানে থাকি আমি,
ভ্রাতৃঘাতী একুশ নম্বর।'

পুরো পৃথিবীর জন্য

প্রণবেন্দু দাসগুপ্ত

অন্ধকারে, বিপুল মেঘের সঙ্গে দেখাশোনা করে বসে থাকি।
পুরো পৃথিবীকে একবারে দেখা গেলে, খুব ভালো হ'তো।
এক ঝলক পাখি শুধু আকাশ ধবল করে উড়ে যায়।
মানুষ কোথাও তার মানুষীকে ভালোবাসছে
এই কথা, নিঃশব্দ চেয়ারে বসে ভেবে নিতে পারি।
কোথাও কিসের একটা যোগাযোগ আছে,
নইলে এভাবে আমরা কেঁপে উঠি কেন?
কোথাও জলের কোনো আধার রয়েছে, সেইখানে পালক ভিজিয়ে নিলে
মাটি আকাশের কোনো গূঢ় ব্যবহারে আমরা ভেসে যেতে পারি।
অন্ধকারে, বিপুল মেঘের দল এগিয়ে এসেছে।
'যাই, যাই'—বলে হাওয়া, উঠোনের আমগাছটাকে
পুরোপুরি এখনও ছাড়েনি।
জলতরঙ্গের মতো শব্দ জেগে ওঠে।
পুরো পৃথিবীকে যদি এই ফাঁকে স্পষ্ট দেখা যেতো।

আরো প্রিয়

সাধনা মুখোপাধ্যায়

আমি যদি মরে যাই
কবিতার কাঁটা ওপরে রেখে
কবিতার কাঁটা নিচে রেখে
আমাকে কবর দিও
কেননা আমার কবিতা
আমাকে যত জ্বালা যন্ত্রণা দিয়েছে
সে তার চেয়ে আমার কাছে
আরো প্রিয়
তার মধ্যে আমার মাংস-মেদ-মজ্জা
সব গলে-গলে মিশে যাবে
আমার অস্থিতে-অস্থিতে
সেই কাঁটা বিদ্ধ হয়ে বেদনা মাখাবে
আমার হাড়ের ক্যালসিয়াম
চূর্ণ-চূর্ণ হয়ে
বিচিত্র ভঙ্গীতে ছড়িয়ে-ছড়িয়ে
অন্তিম কবিতার অক্ষর
মাটিতেই যেন শেষে
তিলক পরাবে।

সুখ

গোবিন্দ ভট্টাচার্য

মানুষ সুখকে ওজন করে
তার আনকোরা প্রথম সুখ দিয়ে
নতুন সুখ
বারবার পুরোনো সুখের কাছে
হেরে যায়
খড়কুটো দিয়ে নতুন সুখ
ঝুপড়ি বাঁধতে সুরু করলে
ছায়ার মতো
পুরোনো এসে পিছনে দাঁড়ায়
পুরোনো সুখের জোছনায়
নতুন সুখের তারা
ঢেকে যায়
হাওয়ায় জলে পুষ্ট হতে হতে
নতুন সুখের পিঠের উপর
পলির মতো
জমতে থাকে মানুষের পুরোনো সুখ
অবশেষে
নিরেট কুয়াশার মধ্যে
গলা ধরাধরি করে একদিন
দুটো সুখই
গভীর দুঃখ হয়ে যায়।

মশানজোড়ে কয়েক মুহূর্ত
রথীন কর

হৃদয়ের প্রকোষ্ঠের শব্দের মতো
টার্বাইনে একটানা গোঙানি
থেমে থাকা সময়
কংক্রীটের টানেলে
মহিমময় মশানজোড়ে।
এখানে
সতেজ সকাল
ঝিমোনো বিকেল
অথবা
প্রৌঢ় প্রহরের সন্ধ্যা
একটানা স্রোতের
শব্দে মৌন।
এখানে
সকল আশা
শেষ হলে
সকল নিয়ে বসে থাকা
'সর্বনাশের আশায়'।

ভালোবাসা নয়

ঈশ্বর ত্রিপাঠী

এর নাম ভালোবাসা নয়
এ শুধুই মনের শূন্যতা
স্বভাবে সে জন্ম-পরগাছা
চায় বুক নিজেকে সামলাতে।

শরীরের কোনো সাড়া পাও ?
দেখেছ তো সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে
বস্তুতঃ শরীরই প্রেম জানে
সে হাবা নির্বাক মিথ্যা মোহে।

এর নাম ভালোবাসা নয়
এ শুধুই মুহূর্তের নেশা
চোখ থেকে চোখেই মিলাবে
যখন সে হবে প্রত্যাহৃতা।

টেলিগ্রাফের তার ছুঁয়ে চাঁদ

কার্তিক মোদক

মানুষের দুঃখ মানুষ জানে, এখন মানুষের সহানুভূতি বিরল
সারাদিন সাঁতার কাটে মশারির ভেতর দুঃখ সুখে
চাঁদ জেগে থাকে টেলিগ্রাফের তার ছুঁয়ে বাবলা ছা
আকাশ থমথমে, কোথাও বৃষ্টি হতে পারে
দু' একটা বাদলা পোকা উড়তে থাকে ঘরে
কিছু সুখ পেতে ইচ্ছা হয়,
ইচ্ছা হয়
সাঁতার কেটে ছোটবেলার সেই দিনগুলি ফিরে পেতে
সারাদিন একলা ছোটা দুটো পাখি এক চিলতে রোদে
এইভাবে দিনগুলো এক এক করে ডুবে যায়

পীরবাবা পাহাড়ে বনফুল

রঘুনাথ মুখোপাধ্যায়

মনে আছে,
সেই পীরবাবা পাহাড়ের কথা !
বুনো ঝোপ ঝাড়ের ভেতর
সেই আশ্চর্য সরু রাস্তা,
ছেলেবেলায়,
যার রহস্য তোমাকে গভীর ভাবে টানতো।
ছোট্টটো একটা লাঠি হাতে,
তুমি জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতে।
ঝোপে ঝাড়ে সপাং সপাং লাঠির বাড়ি মারতে মারতে
পথ চলতে তুমি।
নতুন কোন পাখি দেখলেই,
তার পেছনে ছুটতে ছুটতে
চলে যেতে অনেক দূর।
শেষ পর্যন্ত,
তোমার গর্বের সেই কালো কুকুরটা—
যে তোমার বাগান পাহারা দিত,
সে একদিন ঠিকই
উবু হ'য়ে বসে, উপরের দিকে মুখ তুলে
হু-উ-হু-উ করে ডেকে উঠলো।
তোমার মায়ের ভয়ের কারণ,
সেই কালো।
মা বলতেন—
ওটা ভারি অলক্ষুণে, বলাই···
তুমি সব উপেক্ষা ক'রে,
ওই বুনো ঝোপ ঝাড়ের ভেতর
আশ্চর্য এক সরু রাস্তা দিয়ে ছুটতে ছুটতে
পীরবাবা পাহাড়ের চূড়োয় বসে শুনতে পাচ্ছো,
তোমার কালো কুকুরটা ঠিক সেই ভাবেই,
উবু হ'য়ে বসে, উপরের দিকে মুখ তুলে
হু-উ-হু-উ ক'রে ডেকে যাচ্ছে।

পুকুরের মাছ

কেদার ভাদুড়ী

সমুদ্রে সকাল হলো কেউ এলো কেউ গেলো ফিরে
জলকন্যা উঠে এসে জলে ভেসে অনন্যা এমন
অর্ধেক মাছের অঙ্গ সঙ্গে তার অপর অর্ধেক
মরকত বর্ণ নিয়ে হর্মতলে স্বর্ণ-মায়াজাল

সমুদ্রে এসেছে ঢেউ আরও কেউ অমন্ত্রক প্রাণ
জলকন্যা চেয়ে দেখে চারিদিকে লাল নীল মাছ
বেগুনি হলুদ হ'য়ে কথা বলে অস্ফুট অনেক
যার শব্দ শব্দ নয় যার অর্থ অর্থ নয় কোনো

কেননা হৃদয়ে সেও সুখ আর দুঃখকে দেখেও
জানেনা রহস্য তার ক্রমে ক্রমে কিংবদন্তী হয়
তবুও গল্পটা হলো জলকষ্ট স্থলকষ্ট আর
হাতি ঘোড়া রাজহাঁস তিমি মাছ হাঙরের পেট

সমুদ্রে সকাল হলো কেউ এলো কেউ গেলো ফিরে
জলকন্যা জলে ডুবে অকস্মাৎ জলে ডুবে গেলে
তখুনি ধীবর এক জালে প'ড়ে জড়িয়ে হঠাৎ
বরং সে চোখে দেখে চুনোপুটি পুকুরের মাছ
শুগ্‌লি বা শামুক খেয়ে শ্যাওলায় ঢেকে আছে প্রাণ
জলজ স্বপ্নের ঘোরে ওড়ে পোকা পোড়ে পাখি সভ্যতা বানান

P29402

সংসার

মীনা ভৌমিক

তোমাকে সাজাতে চেয়েছিলাম
যেখানে বসে খেতে চেয়েছিলাম
ভালোবাসার নরম আলো,
যার রঙীন বুকে শুয়ে
দেখতে চেয়েছিলাম, নক্ষত্রময় আকাশ,
যার বাতাসে খেতে চেয়েছিলাম ভবিষ্যতের সুখ—

সব কেমন ম্লান হয়ে গেল দিশাহীন অভিসারে
সেদিন ছিল অচঞ্চল বাঁচার পিপাসা।
ঝড়ের উন্মাদনা পথ দেখিয়েছিল, এই উত্তানের
গভীর আগ্রহে এসে উঠেছিলাম এই প্রাঙ্গণে
ক্লান্ত শরীরে সজীব আশা, মৃদু মৃদু ঢেউ
গোপনে সবুজে শুয়ে হৃদয় আলোকিত ছিল কি ?

বর্ষার ভেজা সবুজে, লেহন করতে এগিয়ে এলো
গ্রীষ্মের খরা। প্রচণ্ড রোদে শুকিয়ে গেল জল।
সেই তালে আমার ভালোবাসা সেদ্ধ হোচ্ছে,
ঝলসে দিচ্ছে আমার অজস্র অভীপ্সা।
তবু থাকা, তবু ভালোবাসা—
আটপৌরে জীবনের বাঘবন্দী ছকে।

হিন্দুর বউ

দাউদ হায়দার

নিভন্ত চুল্লির পাশে জেগেছিল চাঁদ ; সাংসারিক দৃষ্টি নিয়ে
কোনদিন দেখি নাই আমি, মূলত দেখার চোখ ছিলনা এযাবৎ
—একবার গঞ্জ থেকে ফিরবার পথে আমার সঙ্গে এসেছিল
সেই আমার চাঁদের সঙ্গে সারারাত পাশাপাশি ভ্রমণ।
নিভন্ত চুল্লির পাশে শুয়ে ছিল হিন্দুর বউ ; আরো ছিল
খড়কাঠ ; —আমার কোন ব্যক্ত ব্যাপকতা ছিলনা, সঙ্গে ছিল
একটি গোপন ব্যথা ও ক্রন্দন !
—আমরা পোড়াবো বউ, দীঘির শ্মশান ঘাটে।
"মৃতের কোন বংশ পরিচয় নেই, শ্মশানে পুড়লে হিন্দু
প্রতিবেশী মুসলমান গিয়েছে কবরে"—বলেছিল পুরোহিত
পুড়ে গেল অনুরাধা, পুড়ে গেল অস্থিমাংস ; উভয়ত
পোড়েনি শুধু চোখ দুটো, দেখছিল আমাকে
চাঁদ হয়ে জেগে আছে কপালের টিপ,
নিভন্ত চুল্লির পাশে।

বালক তুই, একটু ভাবিস

জীবেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

একটা ফুল যদি তোমার ছোঁয়ায় একটু কেঁপে ওঠে
খুলে দেয় সব পাপড়ি
তবে হাজার দুয়ার এগিয়ে গেল,
একটা ফুল যদি তোমার ছোঁয়ায় ভেঙে যায়
খ'সে যায় সব পোষাক
তবে লক্ষ দুয়ার পেছিয়ে গেলে ;
ওরে বালক, তোর সামনের পথ এখন নীতিদীর্ঘ
তার পরেই তোকে ফুল ছুঁতে হবে
তারপরেই লক্ষ দুয়ার না হয় হাজার দুয়ার !
একটু ভাবিস।

সামনে অনেক কাজ
দীপক জানা

রক্ত-কণিকা
হে রক্ত-কণিকা আমার
ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে
আর রাত বাড়িও না।

পুরোনো আড়মোড়া
পোড়ো পাশফেরা
হোক ফেরারী কোকিল,
আকাশের কোণে কোণে
কালো মেঘ ছিঁড়ে ছিঁড়ে
রাঙা হোক শিউলী-ভোর।
রাতের শিশিরে নেয়ে
শারদ সকাল
হালি গাছালির হাতে
হাত মেলাক।
কাঁচা শরত রোদে
বাহু সেঁকে নিয়ে
রক্ত-কণিকা আমার—
সচল হোক ধমনীতে।

এখন অনেক কাজ,
শপথ নিয়ে এগিয়ে যেতে
সামনে অনেক কাজ।

বেলা বয়ে যায়

রত্নেশ্বর বর্মণ

লেনিনের স্টাচুর চারদিকে ঘেরা যে রেলিং, সেই রেলিং-এর গায়ে একটা লক্ষ্মীছাড়া কাক, রোঁয়া ওঠা ম্যাটমেটে রংয়ের, কাকটা চিৎকার করছিল—কা, কা। ল্যাম্পপোস্টগুলোতে এখনো বিজলি বাতি জ্বলছে, আকাশে বাঁকা ছোরার মতো এক ফালি চাঁদ তখনও অমলিন। ইসপ্লানেডের উন্মুক্ত জায়গাটা প্রায় জনবিরল, প্রায় নিস্তব্ধ আধঘুমে-আধজাগরণে। দিনের প্রথম ট্রাম এলো, রাতের গর্ভ থেকে আলো জ্বালাতে জ্বালাতে এবং উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে। কয়েকজন লোক নামল ঘুমে-ভারি চোখের পল্লব রগড়াতে রগড়াতে। ইসপ্লানেডের নতুন লাগান ফুলের, পাতাবাহারের বাহারী পাতায় শিশির পড়ে পড়ে গাছের পাতাগুলি ভেজা, চোখের পল্লবের মতোই ভারি। চারদিক জুড়ে কেমন আলস্য, আলসেমি, কেমন যেন আড়মোড়া ভেঙে ওঠার মতো চাঞ্চল্য।

রাজকুমার অনেকক্ষণ আগে রওনা হয়েছিল। বৌ সময় ঠিক করতে পারেনি তাই। কারখানার ঘণ্টা শুনে সময় ঠিক করতে হয়। তাই ভুল হয়ে গেছে। রাজকুমার যা ঘুম-কাতুরে, কোনদিন ঠিক সময়ে উঠতে পারে না। তাই বৌয়ের সাহায্য নিতে হয়। তাছাড়া রাস্তাও অনেকটা,

একটু সকাল সকাল গেলে কাজও জুটে যেতে পারে কিছু। তখনো তার দুচোখ জুড়ে ঘুম। শুধুই ঘুম। তাই ঘুম চোখেই পথে পা দিয়েছে। গত রাত্রের খাবার থেকে চারখানা রুটি লুকিয়ে রেখেছিল রাজকুমারের বৌ। ছেলেমেয়েরা টের পেলে খেয়ে ফেলত। রাজকুমার কিংবা তার বৌ কি খেতে পারত না! নিশ্চয়ই পারত। অমন চারখানা রুটি যখন তখন গোগ্রাসে গিলে খেতে পারে রাজকুমার।

বেরুবার সময় বৌ বলেছিল—একটা রুটি আর একঘটি জল খেয়ে যাও। রাজকুমারের সংসারে পাঁচজন লোক। দুই ছেলে, এক মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী দুজন। এখন ওর একটা রুটি খাওয়া মানে বৌ-এর বরাদ্দ কুরিয়ে যাওয়া। তাছাড়া ওর বৌও আর এখন একা নয়, পেটে আর একটা বাচ্চা, আলো হাওয়ার মুখ দেখার অপেক্ষায় আছে। তাই বলল—একটা রুটি তুই খাস। আমি বাবুদের বাড়ীতে টিফিন পাব।

ঠিক এগারটার সময় বাবুদের বাড়ীতে টিফিন দেয়। তিন-চারটে রুটি, গুড়। ভালো মানুষ হলে ডাল তরকারীও দেয়। গত সপ্তাহের বাবুটা ভালো ছিল। সকালে ডাল তরকারী রুটি আবার বিকেলে চা বিস্কুট। কাজটাও পছন্দ ছিল রাজকুমারের। বাগানের মাটি তৈরী করা। অনেকদিন এমন কাজ পায়নি রাজকুমার। মাটির সোঁদা গন্ধ প্রাণ ভরে নিচ্ছিল। মাটির মধ্যে যেন প্রাণের গন্ধ পায় রাজকুমার। নিজের দেশের কথা মনে হয়। ও যেন কেমন হয়ে যায়।

প্রথম হাঁটতে হাঁটতে রাজকুমার রাস্তায় লোক দেখেনি একজনও। ভাবছিল, যদি আর একটু ঘুমিয়ে নেওয়া যেত। ওর চোখ জ্বালা করছিল। তারপর একটু-আধটু প্রাণ-চাঞ্চল্য লক্ষ্য করছিল। রাস্তায় দু'একজন লোক। তখনো হাওড়া ব্রীজের ওপর ভিখারীরা ঘুমুচ্ছে। গঙ্গার ওপর দিয়ে বয়ে আসা জলো-হাওয়া ছলকে এসে চোখের পাতায় ভারি আরাম লাগছিল। একটু আরামের আবেশ!

রাজকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সারাটা শহর তখনও ঘুমে, সুখী লোকেরা তখনও ঘুমুচ্ছে। পবিত্র পুণ্যাত্মারা রিকশা চেপে চলেছেন গঙ্গাস্নানে। নিরুপদ্রব নিদ্রার পরে, চোখে-মুখে কী স্বর্গীয় প্রশান্তি! এখনিত ঈশ্বর উপাসনার প্রশস্ত সময়। কিন্তু রাজকুমার চলেছে কাজের সন্ধানে।

অনেকক্ষণ হাঁটছে রাজকুমার, পায়ের পাতায় জমে উঠছে শিশির ভেজা ধুলোমাটি, খড়কুটো। ও দেখল, দু-একটা দোকানের একটা একটা করে পাল্লা খোলা। কেউ কোথাও রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে মুখ ধুচ্ছে, দাঁতন দিয়ে দাঁত মাজছে। গলার মধ্যে আঙুল ঢুকিয়ে আওয়াজ করছে সজোরে। ক্রমশ সমস্ত পৃথিবী ব্যস্ত হয়ে ওঠার মহলায় যেন লিপ্ত রয়েছে। অথচ রাজকুমারের কোন কাজ নেই। কোন কাজ জুটবে কী-না কে জানে! হতাশা ওর বুকের মধ্যে পাষাণের মতো জমে থাকে। পৃথিবীর মধ্যে নিজেকে নিদারুণ তুচ্ছ, অকিঞ্চিতকর এবং অপরাধী মনে হয়।

বেশ আগে আগে পৌঁছে গেছে রাজকুমার। এতদূর হাঁটার পর পা দুটো টাটাচ্ছে। ওর জলের তেষ্টা পেল। বুকের ভিতরটা যেন শুকিয়ে আসছে ক্রমশ। ওর বৌ-এর কথা মনে পড়ল। বৌ বলেছিল—একটা রুটি, এক ঘটি জল খেয়ে আসতে। এখন নিজেকে খুব অবসন্ন মনে হল। সে সেই রাত্রি-দিনের সন্ধিকালে লেনিনের মূর্তির সামনে রাধাচূড়া গাছটার তলায় বসে পড়ল। এবং নিদারুণ বিষাদের মধ্যেও দেখল, বাহারী ফুলের গাছে কেমন সুন্দর ফুল ফুটেছে, এবং সোনার থালার মতো একটা সূর্য সাড়ম্বরে কলকাতার আকাশে উঠছে।

এমনি একটা সময়ে রাজকুমারের প্রসন্ন হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু প্রসন্ন হতে পারল না। সে চারদিকে তাকিয়ে দেখছিল। যদি কোন বাবু এখুনি এসে পড়েন কাজের লোকের সন্ধানে—এই সকালবেলা। তবে রাজকুমারের রাত জাগা সার্থক হয়। ও চিৎকার করে জানান দিতে পারে—বাবুগো আমি সব কাজ করতে পারি। মাটি কোপাতে জানি, বীজ বুনতে পারি, জলসেচ করতে পারি, সার দিতে পারি, শস্যের ওপর জাগাতে পারি শিষ, ফুলের গাছে সাজাতে পারি ফুল—লাল, নীল, দেশী-বিদেশী। আপনার দরজায় জানালায় লাগাতে হবে বাহারী রং—গাছের মতো সবুজ কিংবা আকাশের মতো ঘন নীল। কাজের বাড়ী আপনাদের, জল তুলতে হয় তুলব, মাল বইতে হয় বইব। যেমন কাজ বলবেন তেমনি করব। —রোজের কথা বলছেন হুজুর। রেটের টাকাই দেবেন, সাড়ে আট টাকা। বিড়ি দেবেন। আর টিফিন, সে আর আপনাদের ইচ্ছে। চার পাঁচখানা রুটি দেবেন। তার সঙ্গে তরকারী। প্রায় সবাই কুমড়ো-পুঁইশাকের তরকারী দেয়, কেউ কেউ শুধু ডেলিগুড়। বাবুদের বাড়ীর বৌয়েরা রাঁধেন ভালো।

রাজকুমারের বৌয়ের নাম অন্নপূর্ণা। নামের সঙ্গে ভাগ্যের এমন তামাসা সাধারণত বিরল। অন্নপূর্ণার ভাণ্ডার সদাই শূন্য। রাজকুমার—কি যে রাঁধিস, মুখে রোচেনা। অন্নপূর্ণা ঝংকার দেয়—আনোনা তেল-মশলা, ঠিক রেঁধে দ্যব। কথাটা কিন্তু খারাপ বলেনি অন্নপূর্ণা। তেমন তেল-মশলা আর কোথায়! ভাতই যার জোটা দায়, তার আবার তেল-মশলা। ও নিজে নিজে হাসে।

শিকারীর মতো দৃষ্টি ফেলে রাজকুমার। একটা লোক আসছে। ভদ্রলোক। বুড়োমানুষ। এমনি লোকেরাই সাধারণত দিনমজুর খোঁজে—রং-মিস্ত্রী খোঁজে। সৌখিন লোক, হাতে ছড়ি দোলাতে দোলাতে আসছে। লোকটাকে ভগবানের মতো মনে হয়। রাজকুমার প্রতি মুহূর্তে আশা-নিরাশার মধ্যে দুলতে থাকে। ভদ্রলোক কি যেন খুঁজছে। রাজকুমার ভাবে, একবার এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে—বাবু, কাজের লোক চাইছেন। কিন্তু ভরসা পায়না। শেষ পর্যন্ত তাকে হতাশ হতেই হয়। লোকটা আকাশের দিকে তাকাতে তাকাতে কার্জন পার্কের দিকে চলে যায়। বাবুদের মতি-মতলব রাজকুমার বুঝতে পারেনা। বিশেষত কলকাতার বাবুদের।

আর একজন লোক এসে গেছে। কাজ খোঁজার লোক। রাজকুমারের আর একজন প্রতিযোগী। আধ-ছেঁড়া চেক চেক লুংগী পরনে, গায়ে একটা বিবর্ণ, মোটা গেঞ্জি; তার আবার পিঠের ওপর তিনটে ফুটো। নেড়া মাথা লোকটার পেছনে একটা টিকির আভাস। পিট পিট করে তাকাচ্ছে রাজকুমারের দিকে। রাজকুমারও বিরক্তির দৃষ্টিতে তাকাল। নতুন লোকটা রাজকুমারের সামনে খানিকটা দূরে একটা ল্যাম্প-পোস্টের তলায় কাঁকর মাটিতে লেপটে বসল। লোকটার হাতের কণিক দেখে বোঝা গেল, সে রাজমিস্ত্রী। এবং সেই কাজেরই সন্ধানে এসেছে।

এরপর আর একজন এলো। লেনিনের স্টাচুর পাশ দিয়ে পেচ্ছাবখানার দিক থেকে একটি অল্প-বয়স্ক ছেলে, সতের-আঠার বছর বয়সের। বৃষ্টির জল পড়লে দূর্বা যেমন সতেজ সবুজ হয় তেমনি একটা সজীবতা চোখ মুখ জুড়ে। সবে দাড়ি গজিয়েছে। কোমল দাড়ি। ছেলেটা এদিকে এসে চারদিকে

তাকাচ্ছিল, এদিক ওদিক দেখছিল। তারপর সলজ্জ ভাবে এসে রাজকুমারেরই পাশে বসে পড়ল টিপ করে। একেবারে আচমকা। ওর হাতে কোন যন্ত্রপাতি ছিল না। তাই রাজকুমার বুঝতে পারল না, ছেলেটা সত্যিই কী কাজের সন্ধানে এসেছে, না, নিতান্ত খেয়ালের বশে এসে তার পাশে বসেছে। কলকাতা বড় বিচিত্র জায়গা!

এরপর আর একজন এল। তারপর আর একজন। তারপর আর একজন। তারপর আর এক···। এমনি করে রূপকথার গল্পের চড়ুই পাখীর ধান আনার মতো ক্রমে ক্রমে অনেক লোক এসে ভীড় করল। তখন ইসপ্লানেডের আকাশে সূর্য অনেকটা উঠে গেছে। আকাশের ক্ষীণ চন্দ্র অনেকক্ষণ উধাও। ট্রামের মিছিল চারদিক প্রদক্ষিণ করছে। ট্রামগুলি থেকে অবিরাম লোক নামছে। উঠছে।

রাজকুমার বসে বসে এখন জমায়েতের লোকগুলোকে দেখছিল। কেউ কেউ ওর পাশে বসে আছে, কেউবা সামনের দিকে, কেউ ওদিকে ট্রামলাইনের ওপারে বকুলের ছায়ায়। ও এক-দুই করে গুণতে থাকল। বত্রিশে গিয়ে থামল। এবং মনে হল যে, ওর গোণা ঠিক হয়নি। তাই সে আবার গুণতে সুরু করে দিল। এবং ধেড়েরি বলে পরমুহূর্তেই রণেভঙ্গ দিল।

এইবার ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লোকগুলিকে দেখছিল। সবগুলি মুখের আদল, হাত পা, বসার ভঙ্গি। কয়েকজনের পায়ে জুতো আছে এবং কয়জন নগ্নপদ। কে চিন্তিত, কেবা নিশ্চিন্ত। কার হাতে কী যন্ত্রপাতি আছে বা কার কিছুই নেই এমনি বসে আরাম করে বিড়ি টানছে। কে খয়নি চাপড়াচ্ছে। কে উবু হয়ে আছে এবং কে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে।

তারপর পাঠশালার পণ্ডিত মশাই-এর মতো যেন সে প্রশ্ন করে—

—কী নাম?

—রামলগন মিস্ত্রী।

—কী কাজ কর?

—রাজ মিস্তিরি, মকান বানাতে পারি।

—ঘর কোথায়?

—মজফ্‌ফরপুর।

—সন্তান-সন্ততি?

—তিন লড়কা—দো লড়কি।

—তোমার কি নাম?

—হামিদ হুজুর, হামিদুর রহমান। চুনকাম করি, ঘর দোরে চুনকাম। অন্যকাজ দিলে তাও করি। দৈনিক কাজ পাই না তাই বড় কষ্ট।

—বাড়ী কোথায়?

—আজ্ঞে নামখানা থেকে দশ মাইল এগোলে, এই যে রাস্তা দিয়ে বাবুরা পিকনিক করতে যান বকখালীতে, তার পাশে। —ছেলে মেয়ে হুজুর? তিন ছেলে চার মেয়ে। আর হবে না, ভ্যাসাকটেমি হয়েছে স্যর। হ্যাঁ জন্ম-নিয়ন্ত্রণ।

—আজ্ঞে আমাকে বলছেন বাবু? আমার নাম রাজকুমার সামন্ত। বিদ্যাসাগরের বীরসিংহে আমার জন্ম। আজ্ঞে, বীরসিংহ গ্রামে। এখন থাকি—হাওড়ায়, রাস্তার ধারে একটা কুপড়ি তৈরী করেছি। আজ্ঞে, জবর দখল, হাঁ তাই বলতে পারেন। দেশে থাকব? কী জন্য থাকব। সেখানে কোন কাজ নেই। ক্লাস এইট পর্যন্ত পড়েছিলুম। আরও পড়ার স্বপ্ন ছিল বাবু। হাঁ স্বপ্ন, গরীব লোকের আবার স্বপ্ন! তবু স্বপ্ন ছিল, একটু বড় মাপেরই। হাসবেন না তো? তবে বলি। আমার ম্যাজিস্ট্রেট হবার স্বপ্ন ছিল। আমাদের গ্রামে একবার ম্যাজিস্ট্রেট এসেছিল, থানার দারোগার সে কী ছোটাছুটি!

পরে ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারবনা ভেবে, দারোগা হবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলাম। দারোগা হতে না পেরে, কনষ্টেবল হবার স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। তারপর কিছু হতে না পেরে মজুর হয়ে গেলাম। এবং মজুর হবার পরে শুধু সম্বৎসরের জন্য কাজ, দুবেলার খাবার—এক বেলার ভাত, রাত্রের জন্য রুটি, লজ্জা নিবারণের উপযোগী মোটা কাপড়, মাথা গোঁজার বাসস্থানের স্বপ্নই দেখছি বাবু। এবং এই স্বপ্ন দেখতে দেখতে দিন কেটে যায়, রাত্রি আসে। রাত্রি চলে গিয়ে—আবার দিন আসে।

লোকটা আসতেই ওরা সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠল। যারা বসেছিল তাদের সকলেই। রাজকুমারও নিজের স্নায়ুর কোষে কোষে একটা উত্তেজনা বোধ

করল। যদি লোকটা ওকেই পছন্দ করে ফেলে। যদি আজকের দিনের কাজটা ওর জুটে যায়। একটা দিনের জন্য কাজ! শুধু একটা দিনের জন্য নিশ্চিন্তি।

লোকটা পরিদর্শকের মতো কাজ-খোঁজা লোকগুলোর সামনে পদচারণা করে। তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। 'কী কাজের লোক চাই'? —একজন প্রশ্ন করে আগ বাড়িয়ে।

'রং-এর কাজ করাবেন'? —অন্যজন প্রশ্ন করে।

'রাজমিস্তিরী মাংতা সাব?' আর একজন বলে।

লোকটা খুব সতর্ক ভাবে দরদাম শুরু করল। রাজকুমার দূর থেকেই বুঝতে পারে। অনেক টানা-পোড়েনের পর একটা রফা হয়, এটাও বুঝতে পারে। রং-মিস্তিরি ছেলেটা বাবুলোকটার পেছন পেছন চলে যায়। দারুণ কর্মব্যস্ত জনতার ভীড়ের আড়ালে হারিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত, রাজকুমার ওদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে। যাক একজন লোকের কাজ হয়ে গেল। রাজকুমার দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

তারপর আবার চাঞ্চল্যহীন হা-পিত্যেশ। চলমান ট্রামের জানলায়-বসা লোকদের মুখ দেখা, ফুলের বাগান, ট্রামের গুমটি ইত্যাদি দেখা, চিত্রকর যেমন বিশেষ রংয়ে ফাঁকা জায়গাগুলি ভরাট করে দেয় তেমনি, পুরো ফাঁকা জায়গাটা চলমান জনস্রোতে ভরাট করে দেওয়া আছে। সমস্ত কেজো মানুষরা ঘর থেকে বেরিয়ে পড়েছে। রাজকুমার কাজ করতে চায়। কিন্তু বসে বসে অহল্যার মতো পাষাণ হয়ে যাচ্ছে। কারণ কোন কাজ তার নেই।

খানিক্ষণ বসার পর আর ভালো লাগছিল না ওর। সূর্যটা অতি দ্রুত ওপরে উঠে যাচ্ছে। রাজকুমারের পাকস্থলীতে তোলপাড় করতে থাকে। বুঝতে পারে, ক্ষুধা পেটে জাঁকিয়ে বসছে। ওর অমনি নিজের বৌ-ছেলে-মেয়েদের কথা মনে পড়ল। আর বসতে না পেরে, ও দাঁড়িয়ে পড়ল। দাঁড়িয়ে সে দেখল, ট্রাম-গুমটির ঘড়িতে সাতটা বেজেছে।

তারপর আর একজন লোক এল। একটি অল্পবয়স্ক অবাঙালী ছেলে। ছাব্বিশ সাতাশ বছর বয়সের। আবার তেমনি চাঞ্চল্য, স্নায়ুর মধ্যে চাপা একটু উত্তেজনা। সকলেই আগ্রহ ভরে ওদিকেই তাকিয়ে রইল। ছেলেটার রাজমিস্ত্রীর প্রয়োজন। তাই একজন লোককে যেন আচমকা ছো মেরে নিয়ে গেল। রাজকুমার বিহ্বল হয়ে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ।

তারপর আর একজন লোক কাজ পেয়ে চলে গেল। তারপর আর একজন। তারপর আর একজন।

এরপর আর কেউ এলো না। তাই তেমনি দ্বিভাবনা এবং হা-পিত্যেশ। তবু তখনো অনেকগুলো লোক আশা নিরাশার দোলায় দুলছিল। একটা কাজ চাই, একটা কিছু কাজ। ছুতোরের কাজ, রাজমিস্ত্রীর কাজ, যোগান-দারের কাজ, মুটে মজুরের কাজ। যে কোন কাজ।

রাজকুমার ট্রামগুমটির ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখে—আটটা বাজে। আরও একঘণ্টা পার হয়ে গেল। অতি দ্রুত পার হয়ে গেল। রৌদ্রের উত্তাপ ঝাঁঝাল হয়ে উঠেছে ক্রমশঃ। এখনো অনেকগুলো লোক বসে আছে। রাজকুমার যেন ভীষণ দুর্বল বোধ করে। নিজেকে খুব অসহায় মনে হয়। কাজের প্রত্যাশায় অপেক্ষারত অন্যান্য লোকেদের কথা ভেবেও নিজে দুঃখ বোধ করে। খানিকক্ষণ ঝিমিয়ে বসে থাকার পর হঠাৎ রাজকুমার আবিষ্কার করল যে, সে প্রায় একাকী হয়ে গেছে। তার পাশে আর দুজন মাত্র লোক বসে আছে। অন্যেরা সকলে ওর অলক্ষ্যে চলে গেছে। কাজ পেয়ে নয়, কাজ না পেয়ে হতাশ হয়ে চলে গেছে।

এখন ওরা তিনজন মানুষ বসে আছে। মাত্র তিনজন। রাধাচূড়ো গাছটার ছায়ায়। খানিকটা দূরে দূরে। সেই লুঙ্গিপরা লোকটা যার গায়ের গেঞ্জীর পেছনের দিকে তিনটে ফুটো আছে। আর অন্যজন সদ্য কৈশোর অতিক্রান্ত, খাকি প্যাণ্টপরা ছেলেটা। সারা মুখভর্তি বসন্তের দাগ। মায়ের দয়ার চিহ্ন সসম্মানে বহন করে চলেছে। বহন করে চলবে হয়তো বা বাকী জীবন।

সূর্যের কিরণ এখন আরও তীক্ষ্ণ। শুধু সূর্যতাপের দাপট পৃথিবীময়। রাজকুমারের একবার ইচ্ছে করল, অন্য দুজনের সঙ্গে একটু কথা বলে। সুখ দুঃখের কথা। ঘর-গেরস্থালির কথা। হিন্দুস্থানী লোকটা ছাবরা কিংবা মজফ্‌ফরপুরের। অল্পবয়সী ছেলেটা হয়ত সুন্দরবনের বানভাসি মানুষ। কাজের খোঁজে ভাসতে ভাসতে কলকাতায় এসে ভিড়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কথা বলার মতো উৎসাহ পায়না। কেমন ম্রিয়মান হয়ে থাকে।

নিষ্ঠুর সূর্য কেবলি রৌদ্র ছড়ায়। রাধাচূড়ার ছায়া ছোট হয়ে যায়, সরে সরে যায়। এক সময় একফালি ছায়ার মধ্যে ওরা তিনজন ঘন হয়ে

আসে। একজনের পিঠের সঙ্গে অন্যের পিঠ ঠেকে যায় এমনি কাছাকাছি। অথচ কেউ কারো সঙ্গে কথা বলে না। শেষ পর্যন্ত ওরা ফালি ছায়া নিয়ে কাড়াকাড়ি করতে থাকে।

এখন এই সকাল নটায় ভীষণ কর্মব্যস্ত, কোলাহলমুখর ইসপ্লানেডের মধ্যে রাজকুমার একটা নিঃসীম নির্জনতা খুঁজে পায়। সে সমস্ত পৃথিবীর কথা ভুলে যায়। পিঠ ঠেকিয়ে যারা বসে আছে তাদের কথাও ভুলে যায়। শুধু চারটি মুখ ওর সামনে ভিড় করে। চারটি ক্ষুধার্ত মুখ কপাটি খেলোয়াড়ের মতো ঘন হয়ে ঘিরে ঘিরে আসে। ওরা যেন রাজকুমারকে জাপটে ধরে। ওর দম যেন আটকে আসে। ও গোঙাতে থাকে—কপাট, কপাট, কপাট। অস্ফুটে বলতে থাকে—কিছুতেই না। যতক্ষণ দম আছে চলবে। আমি হারব না।

হঠাৎ চমকে উঠল ও। ওর পাশের লোকদুটো এখনো বসেই আছে। ওরা তিনজন পরস্পর পরস্পরের দিকে চাইছিল। মুখে কথা ছিল না। বোধহয় ভাবছিল, কে আগে উঠে যাবে। উঠতেও যেন লজ্জা হচ্ছিল, বসে থাকতেও লজ্জা। কিংবা হতাশার শৈথিল্য। পায়ের তলার বাঁধান জায়গাটা উত্তাপে তেতে উঠেছে। এখন কয়টা বাজে? আর ঘড়ি দেখার কোন মানে হয় না। এখানে বসে থাকার মানে হয় না। সময়টা অতি দ্রুত বয়ে যাচ্ছে।

আজকে আমার কাজের ভীষণ দরকার ছিল—রাজকুমার বিড় বিড় করে বলল। এবং আজ কোন কাজ হবেনা ভেবে ওর দারুণ খারাপ লাগল। এখন ও বুঝতে পারল যে, আজ তার কাজ হবে না। ওর স্ত্রী আর তিনটি সন্তান চারখানা রুটি সকালে ভাগাভাগি করে খেয়ে, আর সারাদিন রাস্তার কলের জল খেয়ে খেয়ে পেট ভরিয়ে সন্ধ্যার দিকে তাকিয়ে থাকবে, তার ফেরার অপেক্ষায়।

এখন রাজকুমার কোথায় যাবে। ও দাঁড়াতে গিয়ে যেন টলতে থাকে। এতক্ষণ তবু একটা কল্পনার ঘোরে ছিল। এখন সে কী করবে। এখন কোন স্বপ্ন নেই, কোন কল্পনা নেই। ওর সঙ্গী দুজন লোক চলে গেছে কখন। এখন সে একা, ভীষণ একা।

রাজকুমার কোন্‌দিকে পা বাড়াবে সে জানে না। তার পায়ের তলার মাটি কাঁপতে থাকে। তার মাথার ওপরের আকাশও যেন নড়ছে। এতক্ষণ ওর বামদিকে একটা ইমারতের ওপর আটকান ছিল একটা হোর্ডিং, সিনেমার ছবি—নায়কের ছবি, নায়িকার ছবি। তার পেছন দিকে আর একটা ইমারতের ওপরে এমনি আরও তিন-তিনটি ছবি হোর্ডিং-এ আঁকা, সেই সমস্ত ছবিতে এমনি অনেক অনেক নায়ক, কারো হাতে রক্তাক্ত ছুরিকা কারো বা মুখে মোহময় হাসি, এবং অনেক অসংবৃতা মোহিনী নায়িকা। ওর সামনে ছিল লেনিনের মূর্তি, ছায়াঢাকা বনস্পতি, বাহারী ফুলের গাছ। ফুল পাতাবাহারের সমারোহ।

এখন ওর সামনে নেই লেনিনের স্টাচু, পাশে-পেছনে নেই ছবির সেই লাস্যময়ী নায়িকারা, দোর্দণ্ড প্রতাপ নায়করা। কিংবা ভিলেনরা। সামনে নেই ট্রামের তার। গুমটি নেই, ট্রাম নেই। ফুল নেই, পাতা নেই, কিছু নেই। এখন শুধু রোদ্দুর, ভুবন ছড়ান। এখন শুধু রোদ্দুর, সবুজে ফুলের রংয়ের রোদ্দুর। সেই সর্বব্যাপী রোদ্দুরের মধ্যে শূন্যে ঝুলে রয়েছে ট্রামগুমটির ঘড়িটা। এবং কাঁটাগুলি ঘুরছে নিরন্তর। অর্থাৎ সময় বয়ে যাচ্ছে দ্রুত।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার বীরসিংহ গ্রামের রাজকুমার সামন্ত, খাকী হাফপ্যান্টের ওপরে ছেঁড়া হাফপ্যান্ট পরা, নগ্নপদ ও শীর্ণ এবং হাত বাড়ালে বুঝি সূর্যকে ছুঁয়ে ফেলতে পারে এমন দীর্ঘকায় মানুষটা, নতজানু হয়ে বসল। ও প্রার্থনা করে—আমাকে ভবিষ্যতের জন্য কিছু কল্পনা দাও, কিছু স্বপ্ন দাও। দাও সামনের দিকে পা ফেলার জন্য কিছু উৎসাহ।

দোসর

পিনাকীরঞ্জন গুহ

কুকুরটার আর সবই ভালো কিন্তু এই ঘং ঘং ক'রে ডাকটা বনমালীর সহ্য হয় না। ডাকটা মাথায় এসে ভাঙা কাঁসার বাসনের মতো বাজতে থাকে। আগের মতো পা দু'খানা আস্ত থাকলে এখুনি গিয়ে সে ঘা-কতক লাগাত। কিন্তু এখন বনমালী চারপাশের অথৈ অন্ধকারের দিকে চোখ মেলে কিছু একটা দেখতে চাইছে। শরীরে আর মনে হাজার রকমের ব্যাধি এসে উৎপাত শুরু করায় পুরনো পোষা কুকুরটাকেও অসহ্য লাগে। বনমালী জানে, কিছুক্ষণ এরকম ডাকাডাকি চলবে। কোনভাবেই ওটাকে থামানো যাবে না। শ্যামা অনেকদিন বলেছে—'ওটাকে দূর ক'রে দাও'। কিন্তু মন সায় দেয়নি বনমালীর। সেবার বন্যায় গাঁ-গঞ্জের চেহারা যখন পাল্টে গিয়েছিল তখন বানভাসির জলে ভেসে এসেছিল নেড়ী কুকুরটা। শুকনো মাটির আশায় কাঁপতে কাঁপতে বনমালীর ভিটেয় এসে উঠেছিল। সেই থেকেই রয়ে গেছে।

রয়ে গেছে পাড়াশুদ্ধ লোকের গালাগালি খেয়েও। শ্যামাও কম লাথি-ঝাঁটা মারে না কুকুরটাকে। তবুও কেমন যেন থেকে গেছে জীবটা। হয়তো নেহাত-ই কুকুর তা-ই। কথাটা বনমালী ভাবে মাঝে মাঝে। রাগের মাথায় ব'লেও ফেলে—'তুই হতচ্ছাড়া একেবারেই কুকুর, নইলে সারা দুনিয়ায় মরবার আর ভাগাড় চোখে পড়ে না তোর! তোরা হলি গে স্বাধীন জীব, তোদের আবার দুঃখ কিসের! এই আমার কথাটাই চিন্তা কর—পা দু'খানার জন্য খাঁচায় পড়ে আছি, নড়বার যো নেই! তোর তো বাপু সেরকম নয়—তবে কেন পড়ে আছিস্!'

নেড়ী কুকুর কী বোঝে কে জানে! এগিয়ে এসে বনমালীর গালে গাল রাখে। ল্যাজটা নাড়ায় বার কয়েক। তারপর ডেকে ওঠে ঘং ঘং। আর, এসব আদিখ্যেতা মোটেই দেখতে পারে না শ্যামা। দেখলেই সতের কথা শুনিয়ে দেয়। নির্বিকার বনমালী তখন বোকার মতো হাসে। এই আজ সাত সকালেই কুকুরটা গালে গাল ঘষে দিচ্ছিল। সেই ঘটনা থেকেই আর এক বিপত্তি ঘটে গেল।

সকালবেলার কথাটা ফের মনে পড়ল বনমালীর। এবং সেই সঙ্গে তখনকার শ্যামার ঝাঁঝালো মূর্তিটাও ভেসে উঠলো চোখের ওপর। উঃ, যেন গন্‌গনে আগুন! পলকের মধ্যে সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়! হঠাৎ হঠাৎ রেগে যায় শ্যামা। আর, রেগে গেলে কথাবার্তায় কোনো ধরন-ধারণ থাকে না। বেমক্কা এক একটা কথা ছুঁড়ে দেয় বনমালীর দিকে। যেমন সকালেই দিয়েছিল।

আটটা বাজতে না বাজতেই কাজে বেরোবার তাড়া লেগে যায় শ্যামার। ঠিক সেই সময়টায় পাশের বাড়ির দলুইদের বউ এসে আট আনা পয়সা চাইল। আর, পয়সাটা দিতে এসে ব্যাগ খুলেই তুলকালাম কাণ্ড! বনমালী তখন চায়ের তলানিটুকু জীইয়ে রেখে নিভে-যাওয়া বিড়িটায় আগুন ধরানোর জন্য দেশলাই কস্ করেছে। মুখের কাছে এগিয়ে এসে অনেকটা সিনেমার ঢঙে মুখ-নাড়া দিল শ্যামা—'তুমি পেয়েছ কি বলতে পারো? আবার আমার ব্যাগ থেকে পয়সা সরিয়েছ? ছি ছি ছি ছি! তোমার মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে দেওয়া উচিত। আর কবে তোমার আক্কেল হবে!' এই রকম আরও গোটাকতক মারাত্মক তীর কাজে বেরনো পর্যন্ত ক্রমাগত ছুঁড়ে গেছে শ্যামা। মনে মনে হেসেছে বনমালী। পয়সা নিয়ে সে কী করবে! তার তো আর এই বাড়ি ছেড়ে বাইরে বেরুবার সাধ্য নেই। পয়সাটা খরচ করবে কোথায়! নাঃ রাগলে দেখছি শ্যামার আর কোনো জ্ঞান-গম্যি থাকে না! তা-ই টু শব্দটিও করে নি বনমালী। সে জানে, এরকম আগুনের ওপর কুলোর বাতাসদেওয়া নেহাৎ বোকামী! ইচ্ছে ক'রে নর্দমার ময়লায় কাঠি দেওয়া! এটুকু বুদ্ধি অন্তত বনমালীর আছে। না হলে, বছর দু'য়েক ধরে নিশ্চিন্তে সে রোজগেরে 'পরিবারে'র পয়সায় দিব্যি পা তুলে বসে খেতে পারত না।

ব্যাপারটা নিজের কাছেই বেশ গোলমেলে লাগে বনমালীর। কি ক'রে এমন হয়! বুকের মধ্যে মাথার মধ্যে ঘুমন্ত পোকাগুলো নড়েচড়ে ওঠে। তখন কিসে যে কি হয়ে যায় তা কি ছাই নিজেরও খেয়াল থাকে! সেসব খেয়াল রাখার মতো সুখ থাকলে বনমালী আর দশ-পাঁচটা স্বাভাবিক মানুষের মতো বহাল তবিয়তে বৌ-বাচ্চা নিয়ে ফুরফুরে গেরস্থালী করতো। শ্যামা তার সাত পাকে ঘোরানো বৌ—তবুও সত্যিকারের ঘর-সংসার কোনদিনই হয়ে উঠলো না বনমালীর। থেকে থেকে সব কেমন যেন ওলট-পালট হয়ে যায়। কথাটা মাঝে মাঝে বুকের মধ্যে ঠোকর মারে। তখন টনটনিয়ে ওঠে বুকটা। পাঁজরে কেমন যেন কাঁপন লাগে। ঠিক-ঠাক বুঝে উঠতে পারে না বনমালী। ব্যথাটা কিসের—তার কোন হদিস ঠিক করতে পারে না। শুধু মনে হয়, একদিন সে বেঘোরে মারা পড়বে। রাসু ডাক্তারের কথাটা তখন তেমন আমল না দিলেও এখন যেন একটু ভয় পাইয়ে দেয়। তার ফুসফুস আর পাকস্থলীটা না কি অকেজো হয়ে পড়েছে। কি ক'রে ও দুটোকে কেজো করা যায় তা রাসু ডাক্তার জানে। আর বনমালী জানে, ওসব ভাওতাবাজী! ওসব শুধু পয়সা হাতাবার ফিকির! ও-দুটো যন্ত্র একবার বিকল হলে আর মেরামত করানোর কোনো উপায় থাকে না। একী আর লরী বাসের ব্যাটারী, যে 'চার্জ' দিয়ে নিলেই ফের 'সার্ভিস' দেবে!

কিন্তু পা দুটোকে যে আর কোনকালেই ফেরত পাবে না বনমালী। রাসু ডাক্তারের ঠাকুর্দাও তা ফিরিয়ে দিতে পারবে না। দু' বছর ট্রেনে ফেরি করবার এমন বড়সড় খেসারতের কথা সে স্বপ্নেও ভাবেনি। একে নুন আনতে পান্তা ফুরোত তার ওপর ভগবানের মোক্ষম মার। সংসারটা না থাকলে পাকাপাকি ভিখারী হয়ে যেতে পারত সে। কিন্তু তারও উপায় নেই। ভর যৌবনের টসটসে একটা মেয়েকে বিয়ে করে আরও মাটি খেয়েছে বনমালী।

সেই সময় নেই নারেঙ্গীর হাটে বড় ভগ্নীপতি যখন আঙুল তুলে বলল—'ছুই দেখ, ছুই মেয়েটাকে পছন্দ হয় তো বলো, কথাবার্তা চালাই।' অমনি চোখ তুলে তাকিয়ে আর পলক পড়ে না বনমালীর। শ্যামার ঢলঢলে চেহারাটাই তার মগজটা নাড়িয়ে দেয়। এবং সঙ্গে সঙ্গে বয়সের একরকম সুড়সুড়িও অনুভব করে সে। যে ব্যাপারটা কিছুদিন থেকে তাকে ভয়ানক জ্বালাতন করছিল। শ্যামাকে দেখে তার স্পষ্টই মনে হচ্ছিল, সে যেন ভিজে

বাতাসের সঙ্গে হাসনুহানার গন্ধ পাচ্ছে। নাকের ভিতর দিয়ে গন্ধটা ঢুকে গিয়েছিল একেবারে বুকের মধ্যে—মাথার মধ্যে। এবং আমাকে বিয়ে করবার কিছুদিন পর পর্যন্তও সেই গন্ধটা বুকের মধ্যে আটকে ছিল। তারপর —তারপর একটু একটু ক'রে সেটা ফিকে হয়ে হারিয়ে যায়। এখন আর অনেক চেষ্টা করেও সেই গন্ধটা ফিরিয়ে আনতে পারে না বনমালী।

এরকম অনেক কিছুই আর জীবনে ফেরত পায়নি সে। এক কালের চেনা-জানা অনেক কিছু। খুব ছেলেবেলায় কে যেন বলেছিল, 'এই ছেলের কোন দুঃখ থাকবে না, সব্বাই ওকে যত্ন-আত্তি করবে, সুখে স্বচ্ছন্দে থাকবে তোমার এই ছেলে।' কথাটা শুনে বনমালীর মা খুব স্বস্তি বোধ করেছিল নিশ্চয়ই। বনমালী সেটা বুঝতে পারে এখন। পৃথিবীতে এই একটা জায়গায় কোনো ফাঁকি নেই। মা ফুরিয়ে গেলে সবই ফুরিয়ে যায়। আর সব কিছুতেই তো ভেজাল! এই ব্যাপারটা ঠিক-ঠাক বুঝে নিয়েছে বনমালী। সেই মা ওর ছেলেবেলার জীবনটাকে নিশ্চিন্ত আরামের ক'রে রেখেছিল। বড় বড় বাড়ির ছেলেদের মতো জুতো-জামায় ফিটফাট হয়ে ইস্কুলে যেত বনমালী। এমন কী জলখাবারের জন্য একটা ডবল পয়সাও থাকতো তার পকেটে। ভাবলে বনমালীর মনটা এখনো হু-হু ক'রে ওঠে। কী অফুরন্ত উষ্ণ রোদ্দুর ছিল তখন! কিন্তু হতভাগা ছেলেটা সেই অঢেল রোদ্দুরে রাশীকৃত খড় শুকিয়ে নিতে পারে নি। এখন মাঝে মাঝে মনে হয়—অঙ্কটা নিদারুণ ভাবে ভুল হয়ে গেছে বনমালীর।

আগে আগে এসব ভাবলে বুকের ভিতরটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকতো—এখন তাও না। সব কেমন যেন স'য়ে গেছে। সেই ওলাবিবির মাঠের মধ্যেকার বাজ-পড়া তালগাছটার মতো। আসলে এরকম চুকে-বুকে যাওয়ার মতো বয়স নয় বনমালীর। তবুও কেমন যেন ফয়াটে মেরে গেছে সব। আগে সামান্য কথায় যে কুরুক্ষেত্র বাঁধাতে পারতো, এখন সে সাত চড়েও রা করে না।

না হলে ওই শিরিঙ্গে মেয়েছেলেটাকে দু-চার চড় কষিয়ে দিত অনেক দিন আগেই। এবং এই কাজটা করতে না পারার জন্য ভিতরে ভিতরে আরেকটা বনমালী গজরায়। কেমন যেন রঙ-চটা লাগে নিজের পুরুষালী বোলচটা। তারা তার ঠোঁট দুটো ধনুকের মতো বাঁকিয়ে কখনো কখনো

বলে—মেনিমুখো। মাঝে মাঝে শব্দটা খুবই ভালো লাগে। অনেকক্ষণ ধরে চুষে চুষে খেতে ইচ্ছে হয়। আবার কখনো কখনো চিড়বিড়িয়ে ওঠে সারা শরীর। সেই ঝিমিয়ে-পড়া সিংহটা জেগে উঠে বিড়বিড় করে—'তবে রে মাগী, মুখ খেতো ক'রে দোব।' কিন্তু পারে না বনমালী। একদিনও পারেনি। শ্যামাকে গালমন্দ করতে বা দু-চার ঘা চড়-চাপড় দিতে পারেনি সে। ঠিক-ঠিক হয়ে ওঠে না। এখন তো আর কোনমতেই সে শ্যামার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারবে না। এই পা ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে দুটিন্ত শ্যামাকে কী ক'রে বাগ মানাবে সে!

এই অসহায় অক্ষমতায় কী যেন হয়ে যায় মনের মধ্যে। বুকের মধ্যে ঠিক যেখানে ধুকপুকুনির যন্ত্রটা বসানো—সেখানে একরকম কষ্ট ভেলা পাকিয়ে ওঠে। মনে পড়ে বাবা যেন দাওয়ার ওপর বাঁশের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে হাঁপানির শ্বাস টানছে। বুকটা তার হাপরের মতো উঠছে নামছে। আর উঠোনের কোণে বসে মা কাঠ-কুটো পুড়িয়ে পাচন গরম করছে বাবার জন্য! এসব মনে পড়লে আর শ্যামাকে মারবার কথা মনে থাকে না। মনে হয় ভেঁড়া কাঁথার তলা থেকে কেবলই ভিজে মাটির ঠাণ্ডা উঠে আসছে। আর, পুরনো হারিকেনের চিমনিতে কালি পড়ছে হরদম। বইয়ের অক্ষরগুলো সব ঝাপসা—ঝাপসা। শুধু কানের কাছে অবিরাম বেজে যাচ্ছে বাবার কাশির শব্দ।

এসব ভাবলেই বনমালী কেমন যেন নরম হয়ে পড়ে। না হলে—না হলে একদিন রাত্তিরে বিছানার মধ্যেই সে শ্যামার গলা টিপে ধরতে পারতো। মাসে মাসে কড়কড়ে টাকা রোজগার ক'রে বড্ড দেমাক বেড়েছে! বলে কি না, 'তোমার পাশে শুতে আমার ঘেন্না হয়!' সেই দিনই গলা টিপে দিতে ইচ্ছে হয়েছিল বনমালীর। অথচ পারে নি। শুধু পাশ ফিরে শুয়ে থেকে আকাশ-পাতাল চিন্তা করেছে। অথচ অনায়াসে বনমালী এই সময় বকা-ঝকা করতে পারতো বৌকে। খানিকটা তম্বি না করলে এসব মেয়েমানুষ বশে থাকে না তাও জানে সে। তবুও হয় না—হয়ে ওঠে না।

বসে থাকতে থাকতে লোকের বাত ধরে যায়, আর বনমালী শুকিয়ে আমসি হয়ে যাচ্ছে। আশপাশের বাড়িগুলোতে মেয়েছেলেরা বলাবলি করে—'মিন্‌সের চায়রা তো ভাগাড়মুখো হয়েছে তবু মাগীর নিত্যিনতুন ঠসক

দেখে আর বাঁচি নে।' কেউ কেউ আরও উস্‌কে দেয়—'হবে নে, চাপ্‌রী করলে মেয়েমানুষের অমন একটু-আধটু ঠসক্ বাড়ে—কোতায় কি লটর পটর করে কে জানে বাপু।' অন্য কেউ ফোড়ন কাটে—'হুঁ হুঁ, তাছাড়া আবার কি, গতরখানায় কেমন চেক্‌নাই হয়েচে দেখিস নি, অমন চাপ্‌রীর মুকে সাতবার নাথি মারি!'

এসব কিছুই বনমালীর কান এড়ায় নি। কিন্তু কী করবার আছে তার! শ্যামার জামাইবাবু অধর প্লাষ্টিকের কারখানায় এই কাজটা জুটিয়ে দিয়েছে। অধরের বউ—শ্যামার দিদিটা মরোমরো। মরতে মরতেও বেঁচে আছে। শ্যামা তার জামাইবাবু বলতে মূর্চ্ছা যায়। সংসারে না কি অমন পুরুষ মানুষ হয় না! অমন মানুষ পাওয়া মেয়েদের খুব ভাগ্যের ব্যাপার! বনমালী এর রহস্য জানে। কিন্তু কী বলবে সে শ্যামাকে! বললেই ঝুড়ি ঝুড়ি কথা উপুড় করবে শ্যামা। ইতর ছোটলোক কম্মের ঢ্যাড়স এর চাইতে আর বেশী কি ভাববে—এরকম কথা অনায়াসেই শ্যামা শুনিয়ে দিতে পারে। অথচ বনমালীর পাঁজর ক'খানার মধ্যে কথাগুলো কষ্টের জেলার মতো আটকে থাকে। তখন আর কোনো কথাই বলতে ইচ্ছে হয় না। কখনো কখনো মনের ভার হাল্‌কা করবার জন্য সে ওই কুকুরটার সঙ্গেই কথা বলে। বসে-থাকা বনমালীর কাঁধ ঘেঁসে বসে কুকুরটা। মাঝে মাঝে বিচিত্র শব্দ করে। যেন সায় দেয় বনমালীর কথায়।

বনমালী তখন বুক হাল্‌কা করে—'আচ্ছা আমি কী ইচ্ছে ক'রে বাজা হয়েছিলুম, তুইই বল্! সেই শালার মোড়লরা এসে ভুজুং-ভাজুং দিলে আর নন্দ বাকুলি কত রকম বোঝাতে লাগল আমায়—তবেই না বাজা হলুম। তবু তো ক'টা দিন ভাত হোল আলু সেদ্ধ হোল শ্যামার একখানা ডুরে শাড়ি হোল। নইলে আমার কি সাধ ছিল না—তা শ্যামা আমাকে দোষ দেয়—আমার কথাটা কে বোঝে বল্ দিকিনি!' কাঁদো কাঁদো বনমালীর মুখ দেখে কুকুরটা কী বোঝে কে জানে। মুখটা তুলে গাল চেটে দেয়। বনমালী কাঁদে। এরকম সে মাঝে মাঝেই কাঁদে। শুধু বাজা হওয়ার জন্যই নয়, গোটা জীবনের জন্যই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে বনমালী। শুধু শ্যামার সামনে কাঁদতে সে ভয় পায়। কী জানি কী আবার ভেবে বসে! খেতে দিচ্ছে, পরতে দিচ্ছে, মায় সারা দিনের এক বাণ্ডিল বিড়িও কিনে দিচ্ছে, তবে আবার পুরুষমানুষের

কান্না কেন! সত্যিই তো, অন্তত শ্যামার সামনে তাই কাঁদতে একটু লজ্জা হয় বনমালীর।

তবুও এই ঘন অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ফের তার কান্না পায়। কুকুরটা কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে ঘং ঘং ডাকে। দাওয়ায় বসে থেকেও ঘরের মধ্যেকার ফুস্থর-ফাস্থর কথা শুনতে পায় না বনমালী। কুকুরটা একটানা ডাকে।

আজ সন্ধ্যার মুখেই শ্যামা বাড়িতে ফিরে এসেছে। পিছনে পিছনে অধর। একটু রাত বাড়লে বাড়ি ফিরে যাবে অধর। এখন শ্যামার সঙ্গে একটু রঙ্গ-রসিকতা করছে ঘরের মধ্যে। শত হলেও শ্যামা তার সম্পর্কে শালী। এরকম তো আজকাল রোজই হচ্ছে। কাজ থেকে ফেরবার সময় শ্যামা অধরকে সঙ্গে নিয়ে আসে।

প্রথম প্রথম দু'একদিন দেখবার পর কথাটা পেড়েছিল বনমালী। আর যায় কোথায়! সে কী রণরঙ্গিনী মূর্তি শ্যামার! —'তবু মানুষটা চাকরীটা দিয়েছিল বলে দুটো গিলতে পারছো নয়তো এনামেলের বাটি নিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে হোত!' একবার বলতে শুরু করলে সহজে থামতে চায় না শ্যামা। কথায় কথা জুড়ে যায়। চলতেই থাকে চোখ না বোজা অবধি। ওরকম গনগনে আঁচের মধ্যে আবার জল পড়ে ধোঁয়াও হয় মাঝে মাঝে। শ্যামাও কাঁদে—'সাত পাকে ঘোরানো বউয়ের জন্য আবার বড়াই! কী রাখতে পেরেছো শুনি? খেতই তো সব! নিজে তো মরতে মরতে পা দু'খানা খুইয়ে ঘরে এসে উঠলে—তখন কী ভেবেছিলে সাত পাকে—ঘোরানো বউটার কিসে চলবে! দশজনে লুটে-পুটে খেত, না হয় একজনে খাচ্ছে, তাও তো অপর কেউ নয়—তোমার এত জ্বালাটা কিসের শুনি!' নাঃ কোনো জ্বালা বা যন্ত্রণা নেই বনমালীর। ঘরের মধ্যেকার হাসি মশ্‌করার শব্দ সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো আছড়ে পড়লেও তার কানে যায় না। বনমালী নিজের মনে মনে হাসে কাঁদে, শিশুর মতো দেয়ালা করে।

সে জেনে গেছে, এই দাওয়ায় বসে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া তার আর করবার কিছুই নেই। কুকুরটা যদি অধরের পিছু পিছু দৌড়ে গিয়ে ঘেউ ঘেউ করতে থাকে তো বনমালী নির্জীব গলায় তাকে কাছে ডাকবে—'এই আয়, আয় চলে আয়।' কারণ সে জেনে গেছে, বানে ভেসে-আসা আশ্রিত কুকুরটাকে ঠেলিয়ে দিলেও অধরের গলার নলি ছিঁড়ে ফেলবার মতো কোনো জোর আর নেই।

তৃষ্ণা

অমিয় চৌধুরী

দু এক সময় মনে হয় মানবের, সে মরে গেছে। সমস্ত অস্তিত্বটা তার গুঁড়িয়ে গেছে! ছিঁড়ে ছিঁড়ে গেছে। শুকিয়ে গেছে। মৃত্যুর ঘ্রাণ কেমন বুঝতে পারে। সব অনুভূতি অন্ধকার চেতনায় লুপ্ত হয়ে যায়। একটা গা-গোলানো অন্ধকার। চামড়া চুঁইয়ে শিরা-উপশিরায় নির্বেদ অবসন্নতা। অন্ধকার।

তাই হলেই ভাল ছিল। মরে গেলেই শান্তি। অন্তত: হাড়-বেরুনো জানোয়ারের মতো কঁকিয়ে কঁকিয়ে উঠত না প্রাণটা। লাঠি-পেটা-করে মারা শূয়োরের ছাল-ছাড়ানো আস্ত ধড়ের মত আকাশটার দিকে তাকিয়ে অন্ধকার খুঁজতে হত না। মরে বাঁচত ও। বাবার কাছে অপদার্থ কথাটা শুনতে হত না। মায়ের চোখে অমন বিবর্ণ আলোর বিদ্‌ঘুটে ছায়াটা কাঁপতে দেখতে হত না। ছোট ছোট বাচ্চা ভাইবোনগুলোর কচি কচি মুখগুলো যে রস-না-পেয়ে-শুকিয়ে-যাওয়া ফুলের মত মরা-মরা, তা দেখতে হত না। আর মায়ের শুকনো বুকের তলায় কচি বাচ্চাটা অমন করে চিল্লায়, তাও নিজের কানে শুনে কষ্ট পেতে হত না। বেঁচে যেত মানব।

—নার্স, আলোটা নিবিয়ে দাও।

—কেন, ভাল লাগছে না?

—না, একদম ভাল লাগছে না।

—সে কি! এই তো সবে সন্ধ্যে সাতটা। এরি মধ্যে আলো নিবিয়ে দেব! শাঁখের মত সাদা ইউনিফর্ম পরিহিতা নার্স বুঝিবা কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হয়ে থাকে। বিস্ময় ফোটে তার কণ্ঠস্বরে, 'থাক্ না জ্বালা লাইটটা—'

—না। যা বললাম, করো। লাইটটা নিবিয়ে দিয়ে যাও।

মানব পাশ ফিরে শু'ল। আর আলো নিবিয়ে হিল-তোলা জুতোর খট্ খট্ আওয়াজ তুলে চলে গেল নার্স। মানবের বড় খারাপ লাগল আওয়াজ। মানবের মনে হয়, ভীষণ দাম্ভিক মেয়েটা। ওর দুচোখ জুড়ে অহঙ্কার। ওর জুতোর খট্ খট্ আওয়াজ যেন মানবের বুকের মধ্যিখানে সপাটে হাতুড়ির ঘা মারে। ওর পৌরুষে লাগে। রক্ত ঝরে। মেয়েটা মেয়ে হয়ে চাকরী করছে। ওর বাড়ীতেও বাপ-মা, ভাই-বোন আছে। হয়ত ওরা দিব্যি এক নির্ভাবনার সংসার করে। ওরা সুখী। ওরা অকৃপণ উদারতায় মানুষজনের প্রতি দয়া প্রদর্শন করে। ওরা দিব্যি হাসতে পারে। আর মানব একটা পুরুষ! সে এখনো একটা চাকরী জোগাড় করতে পারল না। বাবা মিথ্যে কথা বলে না। একেবারে নির্জলা সত্যি। মানব অপদার্থ। অপদার্থ মানব এখন ভাবতে পারে, বাস্তবিকপক্ষেই সে একটি নির্ভেজাল অপদার্থ।

অতএব ওর মরে যাওয়াই ভাল। অন্ধকারটা ভারি মিশুকে। বেশ মিশতে পারে মানবের সঙ্গে। ওর জীবনটার সঙ্গে। ওর ভবিষ্যৎটার সঙ্গে। এখন মুখের চেহারাটা কেমন হয়েছে মানবের। দেখা যাবে না। গালে হাত দিয়ে একবার দেখল। দাড়ি হয়েছে। আধ ইঞ্চি হবে। দুটো চোখের কোলে সম্ভবতঃ রাত-জাগা মাতালের মত ঘন কৃষ্ণ ছায়া। আর ওর চোখের তারা দুটো ওদের রান্নাঘরের মাথা-ভাঙা লণ্ঠনটার মত। কাটা আর কালি-পড়া। ভালই হয়েছে। অন্ধকারটা বেশ মিশুকে। লোকের অক্ষমতাকে গুটিয়ে নিয়ে নিপুণভাবে লুকিয়ে রাখে নিজের চাদরের ভেতর। অন্ধকারটা বেশ ভাল। বাবার পৌরাণিক শরীরটার ভাঁজে ভাঁজে আর কোলে কোলে অনেক অন্ধকার আছে। বিকেলের বিধবা অন্ধকার। ওগুলো কিন্তু মিশতে পারে না। আত্ম-কেন্দ্রিক ছেলের মত। মুখ-পোমরা। দো-আঁশলা কুকুরের মত বেতরিবৎ।

ধুর! একটা মশা অনেকক্ষণ থেকে ঘুরঘুর করছিল। চট্ করে এক চাপড় মারল নাকে। হুঁ, শালা মরেছে! হাড়-পিত্তি জলে ওঠে মানবের, শালা মশাটাও কাঁদছে! অত কান্না কিসের বাপ! অত ঘ্যানঘ্যানানি প্যান-প্যানানিই বা কিসের! তোরা তো আর মানব না। তোরা আলোয় যা না! অন্ধকারে এত তোদের মাখামাখি কেন! মানবের কেমন যেন মনে হয়, অন্ধকারটা ওর একলার। অন্ধকারটা অবসর নেয় ঘরে। কলকাতার অন্ধকারটা

বোধহয় মানবের মত ছোট। বেশ মাপে-জোখে কুলিয়ে যায়। হাসপাতালের তরুলতা গাছটাকেও বোধহয় বেশ ভালবাসে অন্ধকারটা। আদর করে জড়িয়ে ধরে, আর ছাড়তে চায় না সহজে, অনেকটা তেমনি।

অন্ধকারটা বেশ। বেকার জীবনের গ্লানি, চেতনার যন্ত্রণা, বাবা-মা-ভাই-বোনের অশক্ত আর অসুস্থ জীবনায়ণ সবকিছু দিব্যি ঢেকে রাখতে পারে। পাশ ফিরে শুল মানব আর একবার। হুঁ পিঠের যন্ত্রণাটা ভাল হয়ে গেছে। শরীরে আর কোথাও কোন ব্যথা-বেদনা নেই। ডঃ বোস এসে সকালে বলে গেছেন, 'আগামীকাল আপনাকে রিলিজ করে দেওয়া হবে, আর ভাববেন না।'

হুঁঃ! কে বলেছে ওকে রিলিজ করে দিতে! ও রিলিজ্‌ড্‌ হতে চায় না। এই তো বেশ শুয়ে আছে। ও রোগী। ওর কোন ভাবনা ভাবতে নেই। নিরভিমান যন্ত্রণা, নম্র অবহেলা, মুক্ত দৃষ্টি। অর্থহীন কিছু কথা। আর কত কী! মানবকে ও সব ভাবতে নেই। ও রোগী। ও ভাববে না। বাবা আকাশের দিকে তাকিয়ে বুক ফাটাক! মা লুকিয়ে লুকিয়ে শীর্ণ অনশন-ক্লিষ্ট শরীরে চোখের জল মুছুক, ক্ষুধার যন্ত্রণায় বাড়ীর প্রাণীগুলো নীল হয়ে যাক। মানবের ভাবতে নেই। ডাক্তারের গম্ভীর গলায় নির্দেশ। মানব রোগী। ওর রোগ হয়েছে।

হাসপাতালের নির্লজ্জ নিস্তব্ধতা। ওষুধের গন্ধ। নির্লজ্জ নিস্তব্ধতা ভেঙে মাঝে মাঝে দু-একটা রোগীর যন্ত্রণার কাতরানি। কখনো অস্ফুট, কখনো কখনো তীক্ষ্ণ স্বর। সাদা বেড্‌শীটে শয়ান মানব। সামনে ছোট্ট একটা টেবিল। ওষুধের টেবিল। দুটো লাল রঙের বোতল। মানবকে ভাবতে নেই। ও আর ভাববে না।

অন্ধকারটা ভারী মোলায়েম। নরম মনের মেয়ের মত। না, অন্ধকারটা ঠিক মাধবীর মনের মত। ভাবতে গিয়ে একটু কেঁপে উঠল মানব। অন্ধকারটা সুবিধাবাদী। বুকটা গুলিয়ে উঠল। অন্ধকারটা বিশ্বাসঘাতক। মাধবীর মনের মত। নার্স বলে গেল কব্‌জির ঘড়ি দেখে, সবে সন্ধ্যে সাতটা। কিন্তু সাতটা-টা এক সময় ঘড়ির কাঁটার এক পাক খাবে। ভোর পাঁচটা হবে। রাত্রিটা মরে যাবে। ভোরের বিরক্তিকর আলো ফুটবে। যে অখণ্ড অন্ধকারটা অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত ওর সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে আছে, ওকে মূক করেছে,

বিমূঢ় করেছে, ওর চাঁছাছোলা অনুভূতিগুলোকে ঘসটে ঘসটে ভোঁতা করে দিয়ে ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে দিব্যি, সেটা আস্তে আস্তে পাখা গুটিয়ে নেবে। মরতে মরতে এক সময় ফুড়ুৎ করে পালিয়ে যাবে। হুঁ, ভোর বেলার চিকণ-চাকন আলোয় সামনে অন্ধকারটাকে রাতভর বেশ্যা বাড়ীতে হল্লোড় আর ধামসা-ধামসি করার পর চোখে-মুখে কালসিটে-পড়া বজ্জাত মানুষের মত মনে হবে।

হুঁ, শালা, মারো গোলি! মানবের মাথার ভেতরটা দপ্‌দপ্‌ করছে। চোখ বুজলে দেখতে পায়, ট্রেন আসছে। অন্ধকারের মধ্যে একটা ক্ষুদ্র বিন্দুর আলো। ফিটনটা ছুটে আসছে। তৃষ্ণার্ত জন্তুর চোখের মত। ট্রেনের হেড্‌লাইট্‌টা কত কাঁপছে। কী ভীষণ! বড় তীব্র। কাঁপছে। কাঁপছে আর ছুটে আসছে। আরও ছুটে আসছে। তারপর, এবং তারপর হঠাৎ··· না, ট্রেন না। মানবের স্নায়ু। দপ্‌দপ্‌ করছে। আবার তাহলে রোগা সকালটা আসবে। কর্পোরেশনের গাড়ী এসে ছরছরিয়ে জল ছিটোবে রাস্তায়। একটি দুটি করে লোক জাগবে। চোখ কচলে উঠে দাঁড়াবে। কলে কলে ভোঁ বাজবে। দলে দলে শূয়োরের পালের মত মানুষ ছুটবে ভড়িঘড়ি। গোঁত গোঁত করতে করতে। ঐসব কাজের মানুষগুলোকে চেয়ে চেয়ে দেখতে হবে। দেখতে দেখতে কাজের অরণ্যে অকেজো মানবের নিজেকে ভাবতে হবে, সে একটি ষোল আনা অপদার্থ।

চোখ জোড়া জ্বালা করছে মানবের। কেমন লাল নীল হলুদ আগুনের টুকরো চোখের সামনে নাচছে। তুবড়ির মত ফাটছে। হুঁ, ঠিক এমনিই একটি অনুভূতি সেদিনও জেগেছিল মানবের। নক্ষত্র-উৎক্ষিপ্ত অগ্নিকণার যেন পুড়ে গেছিল।

সেদিনকার সন্ধ্যাটাকেও মনে হচ্ছিল নরম মনের মেয়ের মত। অথবা রবিঠাকুরের সেই অতি সাধারণ মেয়েটির মত। উঁহু, রবিঠাকুরের কথা ভাববে না মানব। অতিরিক্ত মহত্ত্ব আবার মাঝে-মধ্যে অতিরিক্ত বিরক্তিকর মনে হয়। অথচ সেদিন কেমন মোলায়েম স্বরে ঐ রবীন্দ্রনাথ থেকেই আউড়েছিল মানব—

'তোমারেই যেন ভাল বাসিয়াছি শতরূপে শত বার
জনমে জনমে যুগে যুগে অনিবার'—

—বাংলার ছাত্র যদিও টেনেটুনে পাশ-করা, মানবের পক্ষে ভূরি ভূরি কবিতা আউড়ে মাধবীর মত মেয়েকে চমকে দেওয়া এমন কিছু কঠিন ছিল না। সুতরাং সেদিন যে মুগ্ধ স্বপ্নালু দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে ছিল মাধবী, মানবের চোখের দিকে, সেটা একেবারে মামুলী ঘটনা। ওতে মজা পাবার কিছু নেই।

—কাছে এসো।

—যাঃ, আমার লজ্জা করে না বুঝি!

—লজ্জার কি আছে! হে মাধবী, দ্বিধা কেন। গানটা বেশ।

সেদিনকার আকাশটা আজকের মত নিরর্থক ক্লান্তিতে আচ্ছন্ন ছিল না। কিছু সোনালী তারা ইতস্ততঃ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিল আকাশময়। কুচি কুচি স্বপ্নের মত। বাতাসটাও বোধ হয় বড় পাগ্‌লা ছিল, উন্মন্ করে দেওয়ার মত। আর ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যাল হল্‌টাকে সে নিঃসঙ্কোচে একটি তাজমহল বলে ভেবে নিতে পারছিল। বারো মাস বিলাপের অবকাশ থাকে না, তাই শাজাহান তাঁর অশান্ত ক্রন্দনকে চির মৌনজাল দিয়ে কঠিন বন্ধনে বেঁধে রেখেছেন অতিশয় প্রযত্নে। ভারী মিষ্টি লাগে শুনতে কথাটা। বেশ চমৎকার গুছিয়ে কথা সাজাতে পারেন কবি। কবি। মানব নিজেও দু-চারটে কবিতা লিখেছিল। তবে বাড়ীতে বাপের বিলাপ, আর মায়ের মিনতি শুনে কবিতা লিখতে গিয়ে একদিন নিজেরই মৃতদেহ দেখল মানব নিজেরই মনের মাচায়। একেবারে বিবর্ণ, পচন ধরেছে। দুর্গন্ধ ছুটছে গলিত সেই শব থেকে।

আর সেই দিনই কলকাতার আকাশটাকে পচা-গলা মাংসের মত কুৎসিত মনে হয়ে গেল। পার্কের কৃষ্ণচূড়া ফুলগুলোকে মনে হল গলিত ক্ষতস্থান থেকে নির্গত ঘেয়ো রক্তের ফোঁটা। আর পথ-ঘাটের ট্রামবাসের ভয়ঙ্কর তুমুল শব্দগুলোকে মনে হল বেদম ঠাট্টার কুৎসিত ইয়াকি-মারা হাসি।

মাধবী ডাকল, 'মানব'।

—বলো।

—একটা কথা বলবো?

—বলো।

—তুমি আমাকে ছেড়ে দাও মানব। আমি তোমার জীবনে একটা বড়

অভিশাপ। আমি নিজে আবার তোমার জীবনে গিয়ে বোঝা বাড়াতে চাই না। কেমন যেন কান্না-কান্না শোনাল মাধবীর কণ্ঠস্বর।

বুকের ভেতরটা মানবেরও বড় কম কাঁপেনি। তবু শালিকের বিবর্ণ ইচ্ছার মত মৌন চোখে তাকিয়ে ছিল মানব মাধবীর দিকে।

মাধবীর চোখ দুটো মনে হচ্ছিল মরা কাতলা মাছের চোখের মত। ওর হাতের পাতাটা বড় চক্‌চক্‌ করছিল। অন্ধকারে প্রেতের চোখের মত। চাকরী করে মাধবী। এক মাস হল চাকরী পেয়েছে। মানব আর মাধবী একই সঙ্গে দরখাস্ত করেছিল। মাধবীর হয়েছে। মানবের হয় নি।

একটু চুপ করে থেকে মাধবী আবার বলল, 'আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাই মানব, তুমি বড় কবি হবে, তোমার সাধনার দীর্ঘ পথে এখনো চলতে হবে, শুধু শুধু তোমাকে আমি বিয়ে করে তোমার সাহিত্য জীবনের অকাল সমাপ্তি ডেকে আনতে আমি চাই না।'

একটু থেমে বলল, 'তুমিই তো আমাকে শিখিয়েছো, তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারি প্রেমে—ভালবাসা তো শুধু বন্ধন নয়, মুক্তিও—'

মানবের মনটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। মানব কোন কথা বলতে পারছিল না। মানব বোবা চোখে মাধবীকে দেখছিল। মাধবীর চিকন লোভনীয় গালের ওপর দূরাগত আলোর প্রচ্ছায়া পড়ায় মাধবীকে বড় রমণীয় রহস্যে ঢাকা মনে হচ্ছিল।

একটু পর মাধবী উঠে গেল। কিন্তু শূন্য বুক নিয়ে আরও অনেকক্ষণ বসেছিল মানব সেই নরম ঘাসের ওপর। অন্ধকারটা গায়ে মাখছিল। মাধবী নেই। পাশটা ফাঁকা। বড় শূন্যতা! বড় দুঃসহ। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কান্নার প্রতিরূপ। অন্ধকার। কজিনে ঢাকা আকাশ। ঘেয়ো কুকুর মাঠময় কী যেন শুঁকে শুঁকে বেড়ায়। গ্র্যাণ্ডের কাপে কাপে কৃমি কীট আর গলিত মাংসের গন্ধ। অবক্ষয়ী মানুষের অক্ষম পিঁচুটি, পুঁজ আর নোংরা আবর্জনা।

উঠে দাঁড়াল মানব। হাঁটতে হাঁটতে ভাবে। ভাবতে ভাবতে ভাবতে পারে না। যন্ত্রণায় যন্ত্রণায় যন্ত্রণা পাহাড় পাথর হয়ে যায়।

ধ্বক্ করে আঁতকে ওঠে বুক। পথ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে থমকে এসে দাঁড়াল একেবারে ওয়েলিংটন স্কোয়ারের মোড়ে। হিন্দ্ সিনেমার কাছে। অসম্ভব ভিড়। মানুষ উপচে পড়ছে মাঝ রাস্তা অবধি।

: তুমি ক্ষেপেছ গৌতম' আমি ঐ অপদার্থ বেকারটাকে বিয়ে করতে যাবো অত মূর্খ তুমি আমাকে ভেবো না।

: তুমি তাহলে কি বলে তাকে রিফিউজ করলে ?

: স্রেফ্ অভিনয়।

: অভিনয়!

: তা নয়তো কী! বেশ কান্না-কান্না করে বললাম, আমি তোমাকে মুক্তি দিতে চাই মানব! জানো গৌতম, আজ ভারী চমৎকার করে ওকেই ফিরিয়ে দিয়েছি 'তোমারে যে ছেড়ে যাই সে তোমারই প্রেমে।'

হো হো করে হেসে উঠল গৌতম আর মাধবী। হাজার ইনকামী গৌতম আর চারশ ইনকামী মাধবী চ্যাটার্জি। হিন্দ্-এর আলোর ছটা এসে পড়েছে ওদের চোখে-মুখে, সমস্ত অবয়বে। ওরা হাসছে। ছায়াছবির মত।

মানব হাসল নিঃশব্দে। দূরে দাঁড়িয়ে। 'অপদার্থ' কথাটা বেশ মানানসই মানবের পক্ষে। মানবের বিশেষণ। বিশেষ করে বোকার। বাবা বলে কথাটা। আজ মাধবীর পাতলা আর লিপস্টিক-ঘষা ঠোঁট দুটোও নড়ে নড়ে উচ্চারণ করল কথাটা।

মানব পুনরায় পাশ ফিরল। অন্ধকার। চোখ খুলে তাকাল। এখান থেকেও দেখা যাচ্ছে কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথ। এত আলো জ্বালে কেন ওরা। এর থেকে লোডশেডিং ভাল। অন্ধকারটা বেশ নরম। নরম মনের মেয়ের মত।

না, মাধবীর মত। অন্ধকারটা অবিকল মাধবীর মত। এখন বন্ধুর অভিনয় করছে। মানবের সব কিছু ঢেকে রাখছে আদর করে। ঘণ্টা দশেক পরে আবার ঠিক পালাবে। মানবের শরীরের পাঁজরাগুলো, মুখের দাড়ি আর বেকারীর যন্ত্রণা, সব বেরিয়ে যাবে তখন। আর লোকে অনুকম্পা করবে। করুণা জানাবে। করুণা করতে তো পয়সা লাগে না। বিনি পয়সাতেই তাই লোকে এত বিলিয়ে বেড়ায়। হ'ত করপোরেশনের কাঁকুড়ে চাল, যাগনি বিলি করা বেরিয়ে যেত।

কাল সকালে ওরা মানবকে ছেড়ে দেবে হাসপাতাল থেকে। তারপর আবার সেই ঘামে-ভেজা গন্ধ-গন্ধ জামা পরে অফিসে অফিসে ঘুরে বেড়ানো। আপিসী বাবুদের পান-চিবুনো ঠোঁট দেখে নিস্‌পিস্‌ করা। কলকাতার পথে ঘাটে মেহনতি মানুষের দুর্দাড় ব্যস্ততা দেখা। আর নিজে নিজে পুড়ে পুড়ে মরা।

তার থেকে আজ রাত্রে মরে যাবে মানব। মানব চোখ বুঁজল। মরে যেতে তো পারত সেইদিনই। গৌতম আর মাধবী হাত ধরাধরি করে সিনেমা হলে ঢুকল। আর চিত্রার্পিতবৎ মানব। অনুভূতিহীন। সেই সময় ট্যাক্সিটা হুড়মুড় করে সামনে এসে পড়ল। সাদা কালো লাল নীল অনেক-গুলো প্রেত অনুচর চোখের সামনে নেচে নেচে উঠল। তার পরেই একরাশ অন্ধকার। এবং তারপরেই চোখ খুলে এই হাসপাতাল। কে যে বলেছিল লোকগুলোকে মানবের প্রতি এত দরদ দেখাতে! পরোপকারী লোকগুলো সব একেবারে অপগণ্ড! অবাঞ্ছিত, বিরক্তিকর এবং দুর্মরভাবে অপদার্থ। মানবের থেকেও।

মানবের মনে হল, সে মরে গেলেই ভাল হত। অন্ধকারের নিতল গভীর শান্তি-সমুদ্রে চিরদিনের জন্যে ডুব দিতে পারত। মানব একবার উঠে বসল। তারপর চাদরটা টেনে নিয়ে আবার শুয়ে পড়ল। চোখ দুটো বুঁজে আসছে। অন্ধকার। অন্ধকারটা যদি না কাটে তো খুব ভাল হয়।

তবু অন্ধকার কাটল। আজ চীফ মেডিক্যাল অফিসার নিজে সব রোগী দেখছেন। একটি একটি করে সব রোগী দেখে আসার পর মানবের কাছে এসে দাঁড়ালেন। মানবের মনে হল স্যুট্‌-পরা যম। বেকারীর যন্ত্রণা যদি নরক হয়, তবে ঐ টেথিস্‌কোপওয়ালা লোকটা সাক্ষাৎ যম। এক্ষুনি বলে বসবে, ইউ আর ফ্রেয়ারবাই রিলিজ্‌ড্‌। ব্যস! হয়ে গেল। তারপরেই সকালের হলদে আলোটা হয়ে যাবে অফিসের রোগীর আঁশটে পীতাভ চোখ। তারপরেই আবার সেই অপদার্থতা। আঃ সকালের আলোটা এমন বিকট, বিকলাঙ্গ কেন!

কিন্তু আশ্চর্য! যমটা তো কোন কথা বলছে না। ভুরু কুঁচকে চোখ ছোট করে মানব তার দিকে তাকাতে গিয়ে চোখ নামিয়ে নেয়।

পাশে আর একজন নার্স: এ্যাক্সিডেন্ট কেস্‌ স্যার! এর আজ রিলিজ্‌ হওয়ার কথা। কাগজ-পত্তর তৈরী হচ্ছে।

তবু যম নীরব থাকে। ভারী চোয়ালওয়ালা মুখমণ্ডলে ছায়া পড়ছে। অন্ধকার তো মোটামুটি মন্দ লাগে না মানবের, কিন্তু যমের মুখের অন্ধকারটা অমন ভূতগ্রস্ত বিকারের রোগীর মত বিদ্‌ঘুটে মনে হয় কেন! যম অনেকক্ষণ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল মানবকে। তারপর বলল, 'একটু শোন্ তো দেখি।'

শুলো মানব। সি-এম-ও টেথিস্কোপের চাকতি বসিয়ে বসিয়ে অনেকক্ষণ দেখলেন। বুকে পিঠে পাঁজরায়। মুখটা বড্ড বিশ্রী লোকটার। চশমার লেন্সটা বড্ড পুরু। মানবের মনে হল, লোকটা দূষিত বাতাসের মত। ওর কাছে থাকা যায় না।

নার্স সি-এম-ও-র মুখের দিকে তাকাল।

তিনি বললেন, 'এঁর রিলিজ অর্ডার আপাতত: ক্যান্‌সেল্‌ড্। আর এঁকে টি-বি ওয়ার্ডে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।'

—স্যার! নার্স চোখ তুলল আবার।

উনি মাথা নাড়লেন, 'হ্যাঁ, দুটো পাশই এ্যাফেক্ট করেছে।'

যম চলে গেল। কিন্তু একী! মানব অমন করে কাঁপছে কেন! ইস্! অন্ধকারটা বড্ড বিকট! অসহ্য! দুরূহ! দুর্বিসহ! চোখ দুটো অন্ধকার। কয়েক মুহূর্ত। একটু একটু করে গলে গেল। থর্‌থর্ করে কাঁপছে মানব! সেই ট্যাক্সিটা আবার আসছে নাকি! সেই ভয়ঙ্কর চোখের ট্যাক্সিটা! ঘামছে মানব। কাঁপতে কাঁপতে ঘামতে ঘামতে এক বুক ভয় নিয়ে ঠক্‌ঠক্ করতে করতে কী যেন ঘটে যায় মানব নামে এক বিশ শতকীয় যুবকের চৈতন্যের জগতে। বিস্ফোরণের মত চীৎকার করে ওঠে মানব, 'না, না, আমার কিছু হয়নি, আমি বাঁচব, আমি আর এখানে থাকব না। আমার আজ রিলিজের দিন, আমাকে তোমরা ছেড়ে দাও নার্স—আমি বাঁচতে চাই, আমি বাঁচতে চাই গো—'

কিন্তু সকালটা বড্ড বিশ্বাসঘাতক। মাধবীর মনের মত।

দুলা'দি

কিরণচন্দ্র মৈত্র

মিস লাহিড়ী মিসেস সেনগুপ্তা হবার পর আমি এ অফিসে যোগদান করি। মিসেস সেনগুপ্তা অফিস ম্যানেজারের 'পি-এ'। কাজ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমাকে দিনে বার কয়েক ওর কাছে যেতে হয়। হাত খালি থাকলে বসতে বলে ও নানা গল্প জুড়ে দেয়। ওর বস, মিঃ বাগচী না থাকলে ধূমায়িত নেসকফিও মাঝে মাঝে জুটে যায়। মিঃ বাগচী প্রবীন ও ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ। পি. এ' কে নাম ধরে ডাকা অপ্রচলিত নয়। ইন্টারকাম'এ আমিও শুনেছি মৃদুলা বা দুলা নামে ডাকতে। দুলা নামটা আমার পছন্দ হওয়ায় দুলাদি নামে ডাকার অধিকার দিয়েছিল—'কিন্তু সকলের সামনে নয়।' আমি 'তুমি' সম্বোধনের দাবিও আদায় করলাম।

দুলাদির চেহারা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলা যায়, সাধারণত এইসব অফিসে রূপসী মেয়েদেরই চাকরি হয়। প্রকৃতি দুলাদিকে যা দিয়েছে তারপর আর কৃত্রিমতার খুব একটা অত্যাচার করতে হয় না। দেহের নানা অংশকে খুলে মেলে নগ্নতার অপব্যবহারও করে না দুলাদি। তবে ফরসা নিটোল হাত দুখানার গুণ্ঠন উন্মুক্ত না করলে সৌন্দর্যের দেবতা অসন্তুষ্ট হতেন। সদা মুখে হাসি, সকলের সাথে অমায়িক ব্যবহার এবং অনেককে ভাই সম্বোধন করে অফিসের আকর্ষণ অনেক বাড়িয়ে দিয়েছে দুলাদি।

অফিসের মহিলারা অফিসের বাবুদের দৃষ্টিভোজের বস্তু। দৃষ্টিভোজের বস্তুকে অনেকে কল্পনায় একেবারে চিবিয়ে খেয়ে হজম করে ফেলতে চায়। অফিসের আড্ডার আসরে এরা হচ্ছে অন্যতম আলোচ্য বিষয়; এ আলোচনায় অরুচি ধরে না। এসব আসরের একটা নিয়ম হচ্ছে আলোচনায় যোগদান

না করলেও কারো বিষয়ে রসালোচনার বিরোধিতা করা চলবে না। আলোচনার বিষয়বস্তুও খুব বৈচিত্র্যময়। মেয়েদের সাজ পোষাক, রূপ, চরিত্রহনন, সংসার ও ব্যক্তি-জীবন এবং অফিসের নানা 'বস'কে জড়িয়ে মহিলা সহকর্মিদের সম্পর্কে কেচ্ছা খিস্তি ও গল্প; অনেক ক্ষেত্রে যা বক্তা নিজেও বিশ্বাস করে না। মহিলারাও এসব খবর পেয়ে যান তাদের 'টাউটে'র মাধ্যমে। মিসেস সেনগুপ্তাও ব্যতিক্রম নয়। আড্ডায় বাহাদুরী কুড়োবার জন্যে অনেকে মাত্রা ছাড়িয়ে যায়; আবার অনেক সত্যও বেরিয়ে পড়ে। অমুককে অমুকের সাথে গাড়িতে খুব খারাপ অবস্থায় দেখলাম। মিস অমুক আর মিঃ অমুককে পার্ক ষ্ট্রীটের বার থেকে মাতাল অবস্থায় বেরুতে দেখলাম। বক্তার বাড়ী হয়তো উত্তরপাড়া এবং অফিস ছুটি হওয়া মাত্র হাওড়ামুখো দৌড় মারেন এবং সন্ধ্যাতোর পার্ক ষ্ট্রীট জীবনেও হয়ত চোখে দেখেন নি। মিস অমুকের ওই শাড়িখানা মিঃ অমুক কিনে দিয়েছে এবং মাওনা মাওনাই এত দামি শাড়ি কিনে দেয়নি নিশ্চয়ই! হ্যাঁ, মিস অমুক মিঃ অমুকের ট্যুরের সময় ছুটি নিল; রাঁচি-ধানবাদে কটা দিন দুজনে খুব মৌজ করে কাটিয়েছে। দেখবি মিস অমুক শিগ্রী আবার ছুটি নেবে। ব্যাপারটা আরো সরেস করে বুঝিয়ে দেয়—ঠেলা সামলাতে হবে না, নার্সিং হোম থেকে!

মিসেস সেনগুপ্তা সম্পর্কে আলোচনার ধারাটা মোটামুটি এই ধরনের। আমাকে অনেকে ওর চামচা মনে করবার জন্যে আমার সামনে আরো বেশী করে বলে। আমি যোগদানও করি না, প্রতিবাদও করি না। "ছিল মিস লাহিড়ী, হ'ল মিসেস সেনগুপ্তা! বারেন্দ্র থেকে বন্দি! খুব শাঁসাল পার্টি পাকড়েছে! ভদ্রলোককে এমন অজগরের মত জাপটে ধরেছিল বিয়ে না করে আর উপায় ছিল না! কচি ছেলেদের মাথা খেতে ওস্তাদ; ওইসব মিষ্টি কথা, হাসি, 'ভাই' টোপ ছাড়া আর কিছুই নয়। এখানে আসার আগেও অনেক কচি মাথা চিবিয়ে এসেছে; (বক্তা আমার প্রতি টেরিয়ে তাকাল!)। মিঃ বাগচী একটি বুড়া ভাম। চেম্বারে বসে চা কফি খায় আর পি-এ'র সাথে রসাল গল্প করে। অনেকে নাকি গায়ে টায়ে হাত দিতেও দেখেছে কাঁচের ফাঁক দিয়ে! রোজ রোজ গাড়িতে লিফ্‌ট কি মাওনা দেয় নাকি?"

মিসেস সেনগুপ্তা সম্পর্কে আর একটা রাগের কারণ, সে কারো টেবিলে এসে নীচু হয়ে কাতল মাছের মুখের মত বুকের জামা হাঁ করিয়ে কথা বলে না। যারা সাধারণভাবে অপসংস্কৃতি তথা পূব-পশ্চিম-উত্তর দক্ষিণ কাট্ ব্লাউজের বিরুদ্ধে অত্যন্ত সরব, মিসেস সেনগুপ্তার এই অনগ্রতা—এমন কি বুকের আঁচলটা পর্যন্ত হাঁটতে শেখা বাচ্চার ম'ত ঘন ঘন আছড়ে পড়ে না, তাদের কাছেই অসহ্য। এইসব মেয়েরাই সাংঘাতিক হয়—খোমটার আড়ালে খেমটা; ডুবে ডুবে জল খাওয়া ইত্যাদি।

দুলাদিকে প্রথম দিন থেকেই আমার পছন্দ; ওর অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহারের জন্যে। দুলাদিকে মনে মনে আমি ভালবেসে ফেলেছি; আমার চাইতে বয়েসে বড় হলেও আমিও ভোটাধিকার অর্জন করেছি প্রায় এক যুগ হ'ল। তবে 'বাচেলর' রয়ে গেছি প্রজাপতি সদয় নয় বলে। দুলাদির সঙ্গ আমার ভাল লাগে; ইচ্ছা হয় ওকে আরো কাছ থেকে নিবিড় করে পেতে; ওর সাথে আরো ঘনীভূত হতে; রোমাঞ্চ লাগে ওর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য কল্পনা করতে। চাঁদেরও কলঙ্ক আছে! দুলাদি যে এসব একেবারে বোঝে না তা নয়, তাই আমাকে একেবারে ব্যর্থ মনোরথ হতে হয় না। দুজনের সম্পর্কটাও বেশ সহজ হয়ে আসে।

—বরেন্দ্র হয়ে বঙ্কিকে বিয়ে করলে যে বড়?

—বঙ্কির সাথে প্রেম হয়ে গেলে কি বরেন্দ্র বা কায়স্থকে বিয়ে করে কেউ?

—তোমরা বুঝি 'লব' ম্যারেজ করেছ?

—তোমার কি ধারণা আমার বাবা দেখেশুনে বঙ্কির ছেলে ঠিক করেছিল? এই রকম মোটা বুদ্ধি বলেই তোমার আজ অবধি কিছু হ'ল না।

—তোমার মত কাউকে পেলে বিয়ে করি: দাওনা একটা জুটিয়ে!

—'তথ্য কেন্দ্রে' আমার ছবি সহ দরখাস্ত করে রাখ, জুটিয়ে দেবে।

—তোমার অন্তরের ছবি কোথায় পাব দুলাদি?

—(দুলাদির দীর্ঘ নিঃশ্বাস) ভাগ্যটাও যদি আমার ম'ত হয়?

—তবে'ত সোনায় সোহাগা। আমি চাকরি-বাকরি ছেড়ে ছুড়ে ঘর-সংসার করবো আর গান বাজনা নিয়ে থাকবো!

—বাচ্চা পালন করলেও, ধারণ করতে পারবে কি?

—খুব পারবো। শুনেছি মিনার্ভার জন্ম হয়েছিল পিতা জুপিটারের

মগজ থেকে! আমাদের দেবতারা'ও ভূরি ভূরি.....

প্রদীপের নীচের অন্ধকারটুকুও আমার দৃষ্টি এড়াতে পারেনি; তুলাদির মনে যেন একটা অশান্তি জবর-দখল বাসা বেঁধেছে। অনেক সময় হঠাৎ ওর ঘরে ঢুকে দেখেছি তুলাদি গভীর চিন্তায় মগ্ন; একটা কালো মেঘ দৌড়ে পালাচ্ছে ওর মুখের ওপর থেকে। আড্ডা মহলের বক্তব্য—মিসেস সেনগুপ্তার চোখের নীচে যে কালো দাগ পড়ছে সেটা ওর অত্যাচারের অন্যতম নিদর্শন। অথচ এ হেন মিসেস সেনগুপ্তা একদিন অফিসে না এলে বাবুদের গোটা মুখটাই কালো হয়ে যায়। তুলাদি ক্রুত সঞ্চারিণী হরিণীর মত গোটা অফিসটাকে রোমাঞ্চিত করে রাখে।

শেষ পর্যন্ত তুলাদির বাড়িতে যাওয়ার নেমন্তন্ন আদায় করলাম। তুলাদি প্রথমে রাজি হতে চায়নি। কলকাতার ষাঁড় আর অফিস ছুটির পর ব্যাচেলরের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। হানা দেওয়ার কোন জায়গার সন্ধান পেলে লোক হানা দেবে।

—তাও যদি মিস হতে। রোববার সকালে যেতে বলছ কিন্তু যদি মিঃ আসেন লাঠি নিয়ে!

—সে ভাবনা তোমাকে ভাবতে হবে না।

এমন সাজানো-গুছানো সংসার অথচ প্রথম দর্শনেই মনে হয় প্রাণহীন। দেবতাহীন আধুনিক মন্দিরগুলোর মতো—শূন্য দেবালয়। মিঃ সেনগুপ্ত একটা কারখানার মালিক। কিছুদিন হ'ল বাঙ্গালোরে একটা শাখা খুলেছেন ও সময়টা কলকাতা-বাঙ্গালোরের মধ্যে প্রায় সমান সমান ভাগ করে নিয়েছেন। ওদের একমাত্র সন্তান রাজু রামকৃষ্ণ মিশন বোর্ডিং স্কুলে পড়ে। বর্তমানে মিঃ সেনগুপ্ত বাঙ্গালোরে। তুলাদির ঝি-চাকরের সংসারে অপর্যাপ্ত অলস সময়। আমার জন্যে তুলাদি নিজে অনেক রকম খাবারের ব্যবস্থা করেছিল। এমন সুন্দর করে পরিবেশন ও এমন আদর যত্ন করে খাওয়ানো আমার জীবনে ইতিপূর্বে জোটেনি মায়ের দুধ ছাড়ার পর থেকে।

রাজু প্রতি রোববার আসে না; ওদের স্কুলে দারুণ কড়াকড়ি; সপ্তাহ শেষে গিয়ে দেখা করা যায়। তুলাদি ইদানিং খুব কম যায়। প্রথমে ভেবেছিলাম আমি আসবো বলে তুলাদি ছেলেকে দেখতে যায়নি; পরে বুঝলাম ব্যাপারটা তা নয়।

—আমার সম্পর্কে অফিসে অনেক মুখরোচক কেচ্ছা কাহিনী শোন; জানি তুমি অন্তত সেসবে আমল দাওনা। তবে আমার সম্পর্কে তোমার দারুণ কৌতূহল সেটাও আমি বুঝতে পারি। আজ যখন এসে পড়েছ তোমার কৌতূহল আমি দমন করবো। না, তোমার ইতস্তত করার কোন কারণ নেই—আমারও'ত প্রাণ খুলে দু'টো কথা বলতে ইচ্ছে করে, কিন্তু তেমন শ্রোতা কোথায় পাই!

—যে মেয়ে সম্পর্কে কোন কৌতূহল জাগে না সে মেয়ে একদম 'ডাল'। কথায় বলে নারী রহস্যাবৃতা! তবে তোমাকে দেখলে মনে হয় তোমার ভেতরটা একটা বিষাদ-সিন্ধু।

দুলাদি একটু হাসল। আমিও এলবামটা হাত থেকে নামিয়ে একাগ্রচিত্ত হলাম।

মৃদুলা লাহিড়ী ও অশোক সেনগুপ্তর পরিচয় ছাত্র আমল থেকে। ছাত্রাবস্থাতেই সেই আলাপ ঘনীভূত হয়ে প্রেম ভালবাসায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক ওদের দুজনের বিয়ে হ'ল না। অশোক বিয়ে করল আর এক ধনীর দুলালীকে। দুলাদি তখন বিয়ে থা করবে না এই সিদ্ধান্ত করে চাকরির ধান্ধায় বেরিয়ে পড়ল। মিঃ বাগচী ওর মামা—মায়ের খুড়তুত ভাই। দুলাদিকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। তিনি ওঁর অফিসে একটা কাজ জুটিয়ে দেন। পরে উপরওয়ালা বর্তমান পদে প্রমোশন দেয়। অবশ্য সম্পর্কটা গোপন আছে।

রাজুর যখন তিন বছর বয়েস তখন ওর মা গাড়ী মোটর এ্যাক্সিডেন্টে মারা যায়। নিজেই ড্রাইভ করছিল এবং সামনা সামনি ধাক্কায় স্টিয়ারিং'র উপরই মারা যায়।

অশোকের এই ভয়ঙ্কর দুর্দিনে মৃদুলাকে এসে ওর পাশে দাঁড়াতে হ'ল এক নীরব ভূমিকায়! কিছুদিন পর অশোক আবার মৃদুলার প্রতি মুখ তুলে তাকায়। কিন্তু মনের ভাব ভাষায় প্রকাশ করার মুখ নেই। রাজুর কষ্ট মৃদুলাকে স্মৃতির মেঘকে কাটিয়ে এগিয়ে আসতে বাধ্য করে। একদিন সে নিজেই প্রস্তাব করল। অশোক হাতে চাঁদ পেল। ওদের রেজিষ্ট্রি ম্যারেজ হয়ে গেল। মৃদুলার সাথে ওর বাড়ির সম্পর্ক ছিন্ন হ'ল।

—জানো, ফুলশয্যার রাতে অশোক আমার কাছ থেকে কি প্রতিশ্রুতি

আদায় করে নিল? এবং সেটা রাজুর স্বার্থে! আমাদের কোন সন্তান হবে না এবং রাজুকে নিয়েই আমার মাতৃত্বের সব খাঁই মেটাতে হবে।

—তুমি এ প্রতিশ্রুতি দিলে কেন?

—উপায় ছিল না। মেয়েরা ভালবাসার আগে অনেক কিছু হিসেব করে; কিন্তু একবার যাকে ভালবাসে তার জন্যে অতি সহজে প্রাণ দিতে পারে।

—কিন্তু মিঃ সেনগুপ্তই বা তোমার কাছে এমন দাবী করে বসলেন কেন; তিনিও'ত তোমায় ভালবাসতেন?

—সেই জন্যেই রাজি হবার সময় ভরসা ছিল যে এ প্রতিশ্রুতি চিরস্থায়ী হবে না।

চিরস্থায়ী হলও না; বছর দুয়েকের মধ্যেই মৃদুলা অন্তঃসত্ত্বা হল এবং সেটা অশোকেরই হঠকারিতায়। অশোককে অখুসি মনে হল না। শুরু হল মেডিক্যাল চেক্‌আপ। একদিন অশোক জানল যে ডাক্তার বলছে ইউট্রেসে সামান্য গণ্ডগোল আছে একটা 'মাইনর' অপারেশন করতে হবে। অভিজাত নার্সিং হোমে অপারেশন হ'ল। মা তার পেটের বাচ্চাকেও দেখতে পায়নি। জ্ঞান ফিরতেই বুঝল সে আর নেই। অঙ্কুরেই বিনাশ সাধন করা হয়েছে। প্রথম সন্তান! এতবড় অন্যায়ে কেউ বাধা দিল না! টাকায় সবই হয়। শুধুমাত্র তাই নয়, মৃদুলা নার্সের কাছ থেকে জানতে পারল যে ভবিষ্যতে যাতে আর না হয় তারও ব্যবস্থা করা হয়েছে। শয়তানরা তার মাতৃত্ব কেড়ে নিয়েছে।

—"এতো শুধুমাত্র অন্যায় নয়, ঘোরতর অপরাধ, পাপ!"

যাই হোক সে'ত ঘটেই গেছে। ভালবেসে বিয়ে করেছি, এমন কি দেবতার কাছেও নালিশ জানাবার উপায় নাই। অশোককে প্রশ্ন করায় সে জবাব দিয়েছিল, "মা এবং সন্তান দুজনের জীবনের আশঙ্কা ছিল বলে ডাক্তাররা 'এবরশন' করতে বাধ্য হয়েছে। "ওর" গল্পের দ্বিতীয় অধ্যায়টাও যে আমি জেনে ফেলেছি সেটা অশোক অনুমান করতে পারেনি। আমার সোজাসুজি প্রশ্ন করায় ওর মিথ্যার জাল ভেঙে চুরমার হয়ে গেল; অশোক স্বীকার করল কাজটা অন্যায় হয়েছে। রাজুর প্রতি স্নেহ তাকে অন্ধ করে ফেলেছে। অশোক অনুনয় করলে—'দুলা এর জন্যে তুমি আমায় অভিশাপ

দাও, শাস্তি দাও, কিন্তু রাজুকে দয়া কর; ওকে ফাঁকি দিয়ে চলে যেও না; রাজুই না আমাদের মাঝে দ্বিতীয়বার সেতুবন্ধনের কাজ করেছিল; রাজুকে আমি তোমায় দিয়ে দিলাম; আজ থেকে সে তোমার, একান্তভাবে তোমার সন্তান; তুমি ওকে খুশি মত গড়ে তোল; কথা দিচ্ছি, আমি কোন ব্যাপারে পিতৃত্বের জোর খাটাতে যাব না।'

—এ ব্যাপারে অশোক নিষ্ঠুরভাবে তার কথা রেখেছিল।

দুলাদির দীর্ঘ নিঃশ্বাসে ঘরের আবহাওয়া শোকাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। আমি বেশ অস্বস্তি বোধ করছিলাম, এত দুঃখ যার মনে জমে আছে সে মেয়ে কী করে সদা হাস্য-মুখে সকলের সাথে সমানে অভিনয় করে চলেছে!

—দুঃখকে তুমি সুন্দরভাবে জয় করেছ দুলাদি।

দুলাদি একটু মৃদু হাসল। যে রাজুর জন্যে এত কাণ্ড সে কিন্তু জানে আমি ওর মা নই। ও আমাকে কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। স্নেহ-ভালবাসা, আদর-যত্ন, উপহার-ঘুষ কিছুতেই ওর মন জয় করতে পারলাম না। আমার প্রতি ওর আক্রোশ ক্রমশ উগ্রভাবে প্রকাশ পেতে লাগল। শেষ পর্যন্ত বোর্ডিং স্কুলে পাঠাতে হ'ল জানো, ও রাজুর দৃঢ় ধারণা আমি ওর মাকে তাড়িয়ে দিয়েছি, বাপিকে ওর কাছ থেকে কেড়ে নিয়েছি। ওর বাপি আজকাল ওকে একটুও ভালবাসে না, কাছেও আসে না; রাজু কিছু বলতে গেলে, কিছু চাইতে গেলে, বাপি বলে, মার কাছে যাও, মাকে বল।" একটা দীর্ঘ নীরবতা।

"আমরা তিনজনে একটা ত্রিভুজ রচনা করেছি যার মাঝখানটা শূন্য। কিছুই হল না।" দুলাদিকে এই প্রথম চোখ মুছতে দেখলাম। রবীন্দ্রনাথের দুটি লাইন আপনা থেকেই মনে বেজে উঠল—"ভালো তো বাসিলাম, ভালোবাসা পাইলাম, / এখনো তো ভালোবাসি—তবুও কী নাই।"

স্বখাত সলিল

কানাই কুণ্ডু

সকলেই এসে বলছে, আহা এতো সুখের ব্যাপার। ছেলে, বৌ, নাতি-নাতনী মিলিয়ে সাজানো সংসার। এমন ভরাট সংসারের মাঝখান থেকে আনন্দ নিয়ে চলে যাওয়া, এমন ক'জনের ভাগ্যে জোটে। কিন্তু যার উদ্দেশ্যে বলা সেই বৃদ্ধ মণিমোহন নির্লিপ্তভাবে শুয়ে আছেন। পাড়া প্রতিবেশীরা আসছে। বলছে, হরিনাম করুন। আপনার দুঃখ কি, কর্তামশাই।

অথচ দুঃখের কথাটা কেউ বুঝতে পারছেন না। মণিমোহনের দুই ছেলে, অধীর আর সুধীর। বিশেষ করে অধীর এখন সংসারের কর্তা। সে যে মণিমোহনকে সরিয়ে দিতে চাইছে, এতগুলো লোকের একজনও তা বুঝতে পারছে না। বুঝতে চাইছেও না। সত্যি, দুঃখই বা তাঁর কোথায়। নাতি, নাতনী, ছেলে, ছেলের বৌ নিয়ে তার জমাট সংসার। এর চেয়ে সুখের বিষয় আর কি হতে পারে। কিন্তু বাড়ি, জমি-জমা সবই তো এই বুড়োর কল্যাণে। এর ওপরেই তো ছেলেদের চালিয়াতি। অথচ বুড়ো বাপের অসুখ করল, একটা ডাক্তার পর্যন্ত ডাকল না। কেউ এসে যদি হঠাৎ জিজ্ঞাসা করে, অসুখটা কি? ডাক্তার দেখিয়েছেন? কি বললেন তিনি?

অধীর বলে, বাবা ডাক্তার ডাকতে মানা করেছেন। বলেছেন, ডাক্তার ডেকে শেষ সময়টায় কাটা-ছেঁড়া করে কেন কষ্ট দিবি, আমাকে শান্তিতে যেতে দে।

চুপ করে সব শোনেন মণিমোহন। বাপের সামনে ছেলেটা কি নির্জলা মিথ্যে বুলি আওড়াচ্ছে। প্রতিবাদ করতে চেয়েও কিছু বললেন না

মণিমোহন। এতগুলো লোকের সামনে ছেলেটা অপদস্থ হবে! সেদিন এক ভদ্রলোক তাঁকে দেখতে এসে কাটা-কাটা কথা শুনিয়ে গেল, ঠিকমত চিকিৎসা হলে, বড় ডাক্তার দেখালে আপনার বাবা আরো দশ বৎসর বাঁচতেন। দুই ভাইয়ে চিৎকার শুরু করল, আমার বাবার জন্য আপনার দরদ বেশি। বাবা এলোপ্যাথি চিকিৎসা কোনদিন পছন্দ করতেন না, এখনও করেন না। অধীর বলল, আমি নিজে হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ করি। আমি রোগীর কণ্ডিশান বুঝি। গভীর দুঃখে মুখটা মলিন হল মণিমোহনের। অধীর যদি হোমিওপ্যাথির একটা গুলিও একদিন দিয়ে বলত, বাবা ওষুধটা খেয়ো।

সারা পাড়ার লোক দেখতে আসছে মণিমোহনকে। অধীর পাড়াময় প্রচার করছে, বাবা আর বাঁচবে না, যে কোন সময় হার্টফেল করতে পারে। মণিমোহন ভাবেন, এই কথায় সবাই হয়তো খুব দুঃখ পাচ্ছে অথবা মজা পাচ্ছে কেউ। নইলে তিনি মারা যাবেন, এই কথাটা নিজের জীবদ্দশায় তাঁকে শুনতে হচ্ছে! বিশেষতঃ তাঁর যখন পুরো জ্ঞান আছে! কেউ মিষ্টিটা সন্দেশটা এনে খাওয়াচ্ছেন। নামগান করে যাচ্ছেন। কেউ উপদেশ দিচ্ছেন, গীতাটা মাথার কাছে রেখো। একটু গঙ্গোদক এনে রেখেছ তো। মাঝে মাঝে নামগান কোরো। অধীর সুধীর অবশ্য সে ব্যবস্থার কোন ত্রুটি রাখেনি।

মণিমোহন লক্ষ্য করেছেন সবাই তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার জন্য ব্যস্ত। এমন-কি শ্রাদ্ধে খরচখরচা সামলাবার জন্য অধীর অফিসের কো-অপারেটিভ থেকে টাকা ধার করে মজুদ রেখেছে ঘরে। শুধু তাঁর মরার অপেক্ষা। কিন্তু মণিমোহন জানেন, এখন তিনি মরবেন না। এইভাবে আরো বারো দিন কাটিয়ে দিলেন। একদিন ছেলেদের ডেকে বললেন, তোরা সংসারের কোন কাজ বইয়ে দিস না, আমি এখন মরব না।

ছেলেরা সে কথা কানে নেয় না। যাদের দরকার হতে পারে, তাদের সব ফোন নম্বর নিয়ে রেখেছে। এই বুড়োটা মরলেই যাতে শেষ কাজের ব্যবস্থা করা যায়। তাঁকে যেন তুলে ফেলে দিয়ে আসতে পারলে এরা হাঁফ ছেড়ে নিঃশ্বাস নেবে। তারা ধরে নিয়েছে 'সংসারের কাজ বইয়ে দিস না' এই কথাটা বলা মানেই বাপের সময় হয়ে এসেছে।

মণিমোহনের মনে হয় তিনি যেন তাঁর জীবনটাকে নিয়ে কৌতুক করছেন ছেলেদের সংগে। পনেরটা দিন কেটে গেল একভাবে। সকালে সূর্যের আলোয় ঘর ভরে যায়। আবার অন্ধকার ঘনিয়ে কখন রাত্রি আসে। মণিমোহন মরেন না। শুয়ে শুয়ে তিনি বেশ বুঝতে পারেন এখন তিনি মরবেন না। কিন্তু কেমন যেন কাহিল হয়ে যাচ্ছে শরীরটা। এই ক'দিন আগেও মাঠে ঘাটে বেড়িয়ে আসতেন। মোড়ে বটতলার বেদীতে বসে রাত দশটা পর্যন্ত পাড়ার বুড়োদের সংগে কত গল্প করতেন। ছেলেদের নামে কত মিথ্যে প্রশংসা করতেন। বেশ কাটছিল দিনগুলো। হঠাৎ সেদিন কলতলায় মুখ ধুতে গিয়ে পড়ে গেলেন। অজ্ঞান ছিলেন কিছুটা সময়। সন্ধ্যায় অফিস থেকে ফিরে অধীর কড়া আদেশ দিয়ে গেল, একদম নড়াচড়া করবেন না। আপনার কি আর সে বয়স আছে, না শক্তি আছে।

তারপর কাল হল তাঁর রক্ত-বমি। অধীর তো হাউমাউ চিৎকার জুড়ে দিল, ওরে বাবার কি হল রে! বাবা আমাদের অনাথ করে দিয়ে চলে গেল! বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে যান মণিমোহন। এ কি শোক না ছেলের মাথা খারাপ! তিনি সংগে সংগেই বললেন আমার কিছু হয় নি। তুই চুপ কর্। হোমিওপ্যাথির চিকিৎসক অধীর বলল, আপনার ইন্টারন্যাল হ্যামারেজ হচ্ছে। লাংগ পাংচার হয়ে গেছে। বাড়ি বাড়ি গিয়ে বলে এল, আজকের রাতটা হয়তো কাটবে না। দরকার হতে পারে। একটু সজাগ থাকবেন।

রাত্রি তবু প্রভাত হল। মণিমোহন চিৎ হয়ে শুয়ে থাকেন নিজের বিছানায়। নিজেই অবাক হন, মরলাম না তাহলে! আচ্ছা, তিনি মারা যাবেন এই কথাটা কেন তাঁকে শোনানো হচ্ছে। তিনি তো জানেন, কোন রোগীর সামনে তার অবস্থার কথা আলোচনা করতে নেই। বিশেষতঃ রোগী যখন পুরোপুরি শুনতে পায়। তাঁকে তো শুধু জল খাইয়ে রেখেছে এই পনেরোটা দিন। তাও হরলিক্স্ গ্লুকোজ নয়—মিছরির জল। এই অবস্থায় তাঁর নাকি সলিড ফুড খাওয়া আশংকার কারণ হবে। আর এক বিরক্তি, কিছুক্ষণ পরে পরেই হয় অধীর নয় সুধীর এসে দাঁড়ায়—বাবা, কে এসেছে চিনতে পারছেন। চিনেও না চেনার ভান করেন মণিমোহন। মনে মনে ভাবেন মজা দেখতে এসেছে। সুধীর বলে, পাশের বাড়ীর অমল-

বাবু, নয়তো আমাদের দেশের শিশিরের বৌ। সন্দেশটা খেয়ে নিন বাবা। মণিমোহন সংগে সংগে হা করেন। একটা খাওয়ার পর আবার হা করেন। তখনই সুধীর চিৎকার করে ওঠে, আর দেবেন না। দাদা বলেছে, বাবার সলিড ফুড খাওয়া খুব খারাপ। সে কি দরদের পরাকাষ্ঠা! দেখে গা জ্বলে যায় কি আমার রামভক্ত হনুমান রে! কিন্তু না, মণিমোহন এখন মৃত্যু-পথযাত্রী। তাঁর এসব শোভা পায় না।

মণিমোহন সব বুঝতে পারছেন। এই মাংগার দিন, রেশনের এই অবস্থা। নগদ পয়সায় চাল কিনতে হয়। এ বাজারে ছেলেরা কেন তার পিছনে অপব্যয় করবে। বুড়ো হয়ে থাকা মানেই সংসারের বাড়তি আবর্জনা। তার খাবার জোগাড় করো। দুধ খাওয়াও তিন টাকা সেরের। বুড়ো বয়সের নেশা জোগাও। বেল আনো, হাঁপানি কাশির ওষুধ আনো, নানা ঝামেলা। ছেলেরা সামলাবে কি করে! মধ্যবিত্ত পরিবারের গরীব কেরাণীরা আর কত টানবে! ছেলেমেয়ের স্কুলের মাইনে, বাস, টুকিটাকি আব্দার, বড়টির পকেট হাতড়ানোর ব্যবস্থা। বৌয়ের নাকি ঘরের বায়না। এসব মিটিয়ে একটা বাড়তি অকেজো লোককে টানা সোজা কথা! না। ছেলেদের ওপর তাঁর কোন অভিযোগ নেই।

এই তো মাস দুয়েক আগে অধীর যখন ঝগড়া শুরু করল তাঁর সংগে, খুব অভিমান হয়েছিল। না হয় দিনে এক বাণ্ডিল বিড়ি লাগে মণিমোহনের, তাই নিয়ে এত কথা! বাড়ী থেকে চলে গিয়েছিলেন তিনি। রাত্রে একবার খোঁজও নিল না অধীর। তবুও মণিমোহন নিজেকেই অপরাধী মনে করলেন। হাজার হোক নিজের ছেলে তো। কোথায় যাবেন তিনি। তাই সকাল না হতেই চলে এসেছিলেন। অধীর কেবল খবরের কাগজ থেকে একটু চোখ তুলে তাকাল। বৌমা রান্না ঘরের ভেতর কি যেন গজর গজর করতে লাগল, বোধ হয় রাতের ভাত নষ্ট হয়েছে। কেবল নাতি নাতনীরা আকুল হল, রাত্রে কোথায় ছিলে দাদু, আমাদের কষ্ট লাগছিল। বুক ভরে গিয়েছিল মণিমোহনের। চোখ ভরে জল এসেছিল। আবেগে কথা ভিজে গিয়েছিল, আর কোনদিন যাব না দাদু!

না আর ভাবতে পারছেন না। মাথাটা কেমন ঝিম ঝিম করছে। নিশ্বাস নিতে গেলে গলার কাছটায় কি রকম কষ্ট হচ্ছে। এবার বোধহয়

সত্যি তিনি মারা যাবেন। কেমন যেন লাগছে আজ। মনে হচ্ছে যেন এক আনাড়ি শিশুর ভাবনা! আমি এবার সত্যিই মরবো। হাসি লাগছে যেন। ব্যাকুল হয়ে হাসি চাপতে চাইলেন মণিমোহন। একি তবে মুক্তির আনন্দ। কিন্তু এই বাড়ীর দেনা শোধ করে হাত-পা ছড়িয়ে আয়েস করছিলেন। বাগানের কলা গাছটায় সবে ফলন শুরু হয়েছে। এসব মুছে যাবে তাঁর জীবন থেকে। দূর! কি সব ভুল ভাবছেন তিনি! আসলে মণিমোহন তো নিজেই মুছে যাবেন।

কেমন যেন একটা সুর শুনতে পাচ্ছেন মণিমোহন। কোথায় যেন টেনে টেনে বেহালা বাজছে। মনে হয় এ বুঝি তাঁরই বিদায়ের আয়োজন। পাড়ার লোকদের ভীড় বাড়ছে। মানুষটা চলে যাবে। শেষ দেখা দেখে নিচ্ছে। কেউ মঙ্গল কামনা করছে। আবার কেউ বা সোহাগ করে বলছে আশীর্বাদ করুন জ্যাঠামশাই যেন আপনার মতো ভাগ্য করতে পারি। যেন আপনার মতো সাজিয়ে গুছিয়ে চলে যেতে পারি। মণিমোহন অবাক হন। আচ্ছা ওদের মনে কি একবারও এ প্রশ্ন জাগছে না, আচ্ছা লোকটাকে থেকে যেতে বললে কি হয়? ওরা কি বলতে পারে না, দুটো দিন থেকে যাও বাপু। যাওয়ার দিন তো পড়েই রইল, আর ক'টা দিন থেকে যাও। তা না, কেবল উপদেশ দিচ্ছেন সবাই, আপনার ভাবনা কি, কার জন্য চিন্তা করছেন, কিসের মায়া। ভগবানের নাম করুন।

গা জ্বলে ওঠে মণিমোহনের। ভগবানের নাম কেন করবেন? তিনি কি চোর না ফাঁসির আসামী? এই এক কথা, কাজ নেই তো শুয়ে শুয়ে ভগবানের নাম কর। জ্বালাতন আর কি!

তার চেয়ে পুরোনো দিনের কথা ভাবতে ভালো লাগে। ছেলেবেলার দৌরাত্ম্য, যৌবনের দাম্পত্য জীবন, তারপর সংসার। তাঁর ছেলেরা, নিজের ছেলেরা তো কই কাতর হয়ে পড়ছে না তাঁর মতো! তিনি যেমন হয়েছিলেন তাঁর বাবার মৃত্যুকালে! তিনি যেমন হয়েছিলেন অধীরের অসুখের সময়ে। তখন কতই বা বয়স অধীরের, বছর সাতেক। অবস্থাটা যখন ঘোরালো হল, খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠেছিল তাঁর। অধীরের মায়ের কোলে তখন সুধীর এসেছে। বেচারা ফুঁপিয়ে কাঁদত যাতে তিনি টের না পান। তাহলে নাকি আরো কাতর হয়ে পড়তেন মণিমোহন। পাড়া

পড়শীরা বলেছিল, তুমি আর কি করবে ভাই, সবই ভগবানের করুণা। তবু দমে যাননি তিনি। যমে মানুষে লড়াই করে অধীরকে বাঁচিয়ে তুললেন। আর সেই অধীর, সেই সংসার—আশ্চর্য! যুগ কি তবে সত্যিই বদলাচ্ছে! সবাই বলে আমাদের কালে এমনটি ছিল না। তবে এর পরের কালে কি হবে? অধীরের ছেলেও অধীরকে এমনি করে—না-না, ছিঃ। এসব কি ভাবছেন তিনি। পুত্রের অকল্যাণ কামনা করতে নেই। তার চেয়ে আমি যাই। আমার দিন ফুরোল। এখন আমার যাওয়াই উচিত।

আর উঠতে পারছেন না মণিমোহন। শরীরে একটা স্থায়ী ব্যথার নিয়ত যন্ত্রণা। আর বোধ হয় দেরী নেই। দিনের আলো তাঁর কাছে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কথা বলার মতো শক্তির যেন অভাব বোধ করছেন তিনি। ভাবতেও আর ভালো লাগে না। মনটা কেমন যেন শূন্য, এলোমেলো। এই মনে হয় বোসদের পুকুরে ছেলেবেলার মাছ-চুরি। একটু পরেই মনে আসে ঘর বাড়ির হিসেব। অধীর ক'টা ঘর পাবে। সুধীরকে ক'টা দেওয়া হবে। ছেলেদের কিছু বলে যাওয়া দরকার। সব যেন এতদিনেও বলা হয়নি। কোথায় যেন একটা ফাঁক থেকে গেল। চারিদিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখার চেষ্টা করেন। দেওয়ালে মা কালীর একটা ছবি কেলেণ্ডার কেটে বাঁধিয়ে রেখেছিলেন। সেটাও ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। অথচ এই বিছানায় শুয়ে দুদিন আগেও সেটা স্পষ্ট দেখতে পেতেন। মাথার কাছে কে যেন বসে গীতা পাঠ করছে। ঘরময় ধূপের সুরভি ছড়িয়ে পড়েছে। পেটের মধ্যে একটা তীব্র যন্ত্রণা। মনে হচ্ছে সমস্ত নাড়ি ধরে কে যেন টান দিয়েছে উপড়ে নেওয়ার জন্য। বমির বেগ বাড়ছে।

আচ্ছা মরার সময় এই কষ্টটা কেন? চুপ করে শুয়ে থাকলাম, আস্তে আস্তে মরণ এসে বলছে, চলো হে মণিমোহন, খেলা সাঙ্গ কর। তবে কি সে সত্যিই আসছে, সেই মরণ? মনে হচ্ছে একটা শীতল নদীর স্রোত কেমন যেন বিবশ-করা স্পর্শে তাঁকে ছুঁয়ে যাচ্ছে। স্রোতটা ক্রমশঃ বাড়ছে। পা থেকে শিরশিরিয়ে উপরের দিকে উঠে আসছে। যেন সেই স্রোত, সেই নদী তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায় মেঘনায়—পদ্মায়—সাগরে—অথবা অন্য কোথাও যেখানে তিনি কোনদিন যান নি।

শ্বাসটা জড়িয়ে আসছে। গলার কাছে একটা ঘড়ঘড় আওয়াজ উঠছে। দুই ছেলে পাশে বসে। বাবার কষ্টের কথা জানতে চাইছে। কে যেন রাম রাম, চীৎকার করতে লাগল। আশে পাশে কান্নার আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে। কিন্তু কিছুই শুনতে পাচ্ছেন না মণিমোহন। চোখের কোলে দু' ফোঁটা জল স্থির হয়ে আছে। তিনি এখন গা ভাসিয়ে দিয়েছেন সেই স্রোতে, সেই নদীতে···পদ্মায়···মেঘনায়···সাগরে···।

হোটেলের সেই রাত এবং একটি মৃত মানুষ

নীতীশ বসু

শেখর একটা নারীর হাত ধরে তরতর করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নামল। ওদের রুমটায় গোদরেজের বড় একটা তালা তখনো ঝুলছিল। কেউ দেখল না। অথচ ওরা হয়তো কোনদিন হোটেলে আসবে না। মায়ের মুখে অশোক একদিন শুনেছিল, আসলের চেয়ে সুদের মায়া নাকি অনেক বেশি। অশোক সেদিন কিছু বোঝেনি। তখন ওর বয়স আর কত হবে, এই ধরুন আট কী নয়। শিলিগুড়ির একটা নামী হোটেলের একটা রুমে তখনো রেকর্ড প্লেয়ারের বাজনার তালে তালে নাচছিল ওরা তিনজন—অরুন, অসীম এবং কল্যাণ। টেবিলে ছিল দেশী মাল। অশোকের এই প্রথম আসা। মেয়েমানুষ তো দূরের কথা মদের টেবিলে যে যায় নি·····আর আজ?

মাকে অশোক বলতো, মা আমাদের কী হবে?

মায়ের ওই একটি কথা, সমুদ্রে যে গা ভাসিয়েছে তার আবার ভয় কিসের?

অশোক বারান্দা থেকে দৌড়ে অরুনদের রুমের ভিতরে ঢুকে চিৎকার করে বলল, এসব বন্ধ কর। আমাকে ঘুমাতে দে।

অরুন, অসীম, কল্যাণ যে যার মত ছিটকে পড়ল। রেকর্ড প্লেয়ারে এক সময় ঘষ ঘষ শব্দ করতে লাগল।

অরুন বলল, তোমার আবার কী হল?

অসীম বলল, শালার মালে ধরেছে।

কল্যাণ বলল, এবার ক' নাম্বার?

অশোক চিৎকার করে উঠল। ওসব কিছু নয়। শেখরকে দেখলাম।

শেখর!

শেখর!

কে শেখর?

অশোক বলল, একটা হারিয়ে যাওয়া মানুষের গল্প।

সেই কামাক্যা পাহাড়···আমলকী পাহাড়···এবং ব্রহ্মপুত্র নদী···ছোট্ট একটা রেলওয়ে কলোনী মালিগাঁও, একটু দূরেই গৌহাটী শহর।

আমার আসা যাওয়া···ভালোলাগা এবং শংকরের 'নিবেদিতা রিসার্চ ল্যাবরাটরি' এবং ১৪ই নভেম্বর ১৯৭৪-এ কাটিহার শহরে 'ফরেন প্রাইভেট কন্সার্ন এবং এগজিকিউটিভ' অফিসারের সঙ্গে প্রিয় বান্ধবী পলির চলে যাওয়া এবং·····

অসীম বলল, তা শুরু, তোমার সেই শেখর নামক মালটির সঙ্গে যোগসূত্র?

ফ্লেমিং এই একদিন পলির স্কীন্ টেষ্ট করে পেনিসিলিন সেন্সিটিভ আবিষ্কার করেছিল।

একদিন:

হ্যালো···পলি যে, হ্যাপী নিশ্চয়ই।

কারেক্ট য়ু আর।

তুমি দেখি বেশ ভালো ইংরেজী বলতে শিখেছো?

ওসব যাক্, কেমন আছ?

সেই শেখর, সেই ডক্টর, সেই পলি সেন, সেই একটা পুরুষ, সেই একটা নারী এবং·····

অশোকের আর জানা নেই। এই সেই পুকুর পাড়, যাকে অশোক পদ্মদীঘি বলত, আর ওর পাশেই ছোট্ট একটা হলুদ বাড়ি এবং বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠ, গাছগাছালি···ঠিক ওর একটু দূরেই ছোট্ট একটা নদী—কী যেন তার নামটা···হয়তো ধলেশ্বরী···, যে বসে থাকত সেই বালিকাকে শেখর বলেছিল, ম্যাডাম্ আপনি রোজ রোজ এখানে·····

মেয়েটি চকমকিয়ে উঠল। আমাকে ম্যাডাম না বলে নাম ধরেই ডাকবেন।

থ্যাঙ্ক য়ু।

আপনাকে আমি চিনি। আমার দিদির মুখেই তো……

তোমার দিদি!

কেন আপনি ডঃ দেবযানী করকে চেনেন না?

শেখর কোন কথা বলল না।

অরুন রেকর্ড প্লেয়ারটা আবার চালিয়ে দিল। অশোক চিৎকার করে বলল, ওটা বন্ধ কর, বন্ধ কর প্লীজ…

অসীম বলল, তোমার পাগলামীটা ভালো লাগছে না।

অশোক বলল, আচ্ছা একটা মৃত মানুষ চোখের সামনে হাঁটতে, কথা বলতে দেখলে তোমাদের কেমন লাগবে জানি না কিন্তু…

অরুন বলল, হোয়াট্‌স্‌?

অসীম বলল, তোমার আজ কী হ'ল বলতে পারো?

কল্যাণ বলল, শেখর অশোক, অশোক শেখর…

অশোক বলল, জানিস মৃত শেখরকে দেখলাম ছুট্‌তে ছুট্‌তে একটা বাস ধরল।

অশোকের চোখদুটোয় রাতজাগা ছাপ, লাল…চুলগুলো বিশ্রীভাবে ফ্যানের বাতাসে নাচছে…জানিস লাষ্ট ইয়ারে ঠিক এই দিনেই শেখরের একটা দীর্ঘ চিঠি পেয়েছিলাম।

অসীম বলল, তুমি কী বলতে চাও মৃত একটা মানুষ সে কী করে শিলিগুড়ি শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে…দার্জিলিং রোড, বর্ধমান রোড এবং কার্শিয়াং রোডের উপকণ্ঠে কী করে দাঁড়িয়ে থাকে…কথা বলে…

হাঁ হাঁ অসীম, আমার চোখ কখনো ভুল করতে পারে না।

অরুন বলল, তোমাকে খুব টায়ার্ড লাগছে একটু বিশ্রাম কর।

অশোক বলল, জানিস কিশোর বয়সের সেই ভালো লাগা একটা বালিকার ছবি ওকে বিব্রত করে তুলেছিল কিন্তু গৌহাটী শহরের নামী 'অশোকা রেস্টুরেন্টে' বসে থাকা, গল্প করা সেই ডঃ শেখর দত্ত, ডঃ দেবযানী কর এবং অল ইন্ডিয়া ঘুরে ওদের ঘনিষ্ঠতা বেড়ে ওঠা এবং ময়নাগুড়ির ছোট্ট একটা ঘটনা…আর একটা জীবন এবং একটা জেদী বালিকার নাম তনিমা চট্টোপাধ্যায়…

চাপা একটা দুঃখ অশোকের বুকের ভিতর বাসা বাঁধে।

হঠাৎ-টেলিফোন বেজে উঠল।

ওরা সবাই রিসিভারটা ধরতে গেল।

আমার হতে পারে···

আমার···

আমার···

অঞ্জন ধরলো, হ্যালো···

অসীম অঞ্জনের হাত থেকে রিসিভারটা কেড়ে নিয়ে বলল, হ্যালো···

কল্যাণ মুখের কাছে হাত গোল করে বলল, হ্যালো আমি কল্যাণ বলছি···

অশোক বলল, এত রাত্তিরে কে আবার ফোন করল ?

অসীম বলল, এই যা, লাইনটা কেটে গেল।

কল্যাণ এক চুমুকে দেশী মালকে শেষ করে জড়িয়ে জড়িয়ে কথা বলতে বলতে বিছানায় শুয়ে পড়ল।

অসীম বলল, আমাদের পাশের রুমে ভাড়া করা একটা নাইট গার্ল আছে। ওরা হয়তো এক্ষুনি ওটাকে নিংড়ে ফেলে দেবে ; আমি শালা ওই এঁটোর জন্য বসে আছি।

অশোক যাত্রা পার্টির রাজার মত বা ধূর্ত মন্ত্রীর মত হাঃ হাঃ হাঃ করে চিৎকার করে অনেকক্ষণ হাসলো।

ঠিক সেই সময় হোটেলের বয় এসে বলল, স্যার ওকে পাঠাবো ?

চোখের সামনে অসীম ওকে শক্ত দশটি আঙুলে ছিঁড়ে ফেলল, মাংস—রক্ত একটা বুক···একটা মুখ···

অঞ্জন বলল, অসীম তুই না বলেছিলি এই তো মাস তিনেক হ'ল বিয়ে করেছিস···বৌটাও নাকি খুব ভালো···

অশোক বলল, বাঘের মুখে আবার মাংস বিচার ?

কল্যাণের নাক দিয়ে গর্ গর্ শব্দ বের হচ্ছে। অসীম এখন পৃথিবীর চরম সুখে মুগ্ধ। অঞ্জন এবং অশোক মুখোমুখি। হোটেলের অনেকেই তখন ঘুমোচ্ছে।

অশোক বলল, জানিস অঞ্জন, শেখর বলতো দেবযানী যখন একটা নূতন করে অ্যাকাডেমিক ক্যারীয়ার গড়ছে ঠিক তখন ওকে পড়ে থাকতে হয়েছিল চাংড়াবান্ধার হেলথ সেন্টারে। দেবযানীর ঘর বাঁধার একটা স্বপ্ন, কখনো

শলির প্রসঙ্গে উদাসীন থাকা···

অরুন বলল, তুমি কী বলতে চাও···সেই শেখর আমাদের হোটেলের পঁচিশ নাম্বার রুমে ছিল ?

অশোক প্রায় চিৎকার করে বলল, অবশ্যই।

অরুন বলল, ছাপ্ অসীমটা মালটাকে নিয়ে কেমন করে জড়িয়ে আছে।

অশোক বলল, লাইটটা বন্ধ করে দে। আমরা অন্ধকারে মুখোমুখি গল্প করবো।

অরুন রেকর্ড প্লেয়ারটা আবার চালিয়ে দিল। কী একটা হিন্দী গানের তালে তাল মিলিয়ে অরুন নাচতে লাগল।

অশোকের আজকে কোন কিছুই ভালো লাগছে না। ঘর থেকে বের হয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে রাতের নগ্ন শিলিগুড়িটাকে খুব কাছে দেখতে লাগল। পঁচিশ নাম্বার রুমের দিকে চোখ পড়তেই বুকটা ধা ধা করে উঠল। যে শেখর যে দেবযানীকে 'দোলা বয়কট' আন্দোলনের প্রধান এবং প্রথম ভূমিকা নিয়েছিল সেই শেষে তেজপুর মেডিক্যাল হসপিটাল থেকে ফেরার সময় অসুস্থ দেবযানীকে সাহায্য করা এবং বন্ধুদের কাছ থেকে বিদ্রূপ শোনা··· টি. বি. সন্দেহে নিজেকে সরিয়ে রাখা এবং থুথুর সঙ্গে রক্ত বিষয়ক আবিষ্কার··· ভাবতে ভাবতে অশোকের মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্ করে উঠল। তনিমা লিখেছিল, অশোকদা, জানেন শেখর সুসাইড করেছে। ওর বিছানায় নাকি ঘুমের ট্যাব্‌লেট পাওয়া গ্যাছে···ইত্যাদি অনেক···কিন্তু তনিমা, তোমার সেই মৃত মানুষটি যে তোমার ভয়েই আত্মহত্যা করেছিল তার প্রথম সাক্ষী আমি এবং প্রমাণ এই হোটেলের রেজিষ্টারে, আর হয়তো গন্ধ এখনো পেতে পারো পঁচিশ নাম্বার রুমে।

ইস্ আর যদি কয়েক ঘন্টা আগে জানতাম···

সবাই ঘুমাচ্ছে···অরুন ?

অশোক ঘরের ভিতরে ঢুকলো। লাইট জ্বালালো। অরুন ঘুমোচ্ছে। রেকর্ড প্লেয়ারে ঘষ ঘষ শব্দ করছে। অসীম নগ্ন গোলাপটাকে জড়িয়ে আছে। কল্যাণ বাথরুমে, বমির 'ওয়াক্ ওয়াক্' শব্দ। অশোক সাদা বিছানায় ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিল। আর একটা সকাল মাত্র। ভোর হলেই যে যার মত টাকা দিয়ে চলে যাবে যে যেখান থেকে এসেছিল···

ময়নাগুড়িতে অশোক যখন তণিমা নামে একটা মেয়ের সঙ্গে ইচ্ছে করেই কথা বলবে তখন বুকের ভিতর একটা তীব্র ঘেন্নায় দাউ দাউ করে জ্বলে উঠবে। কেউ জানবে না কেমন করে শেখরের এভাবে বেঁচে থাকা, তুমি তণিমা জানো না।

এই যে অশোক ভাবতেও পারছে না···দেবযানী···পলি সেন···

শেখর এখনো বেঁচে আছে···না শেখরের মত অবিকল একটা মানুষ··· ভাবতে ভাবতে অশোক এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে···

ভাদ্রের দুপুর

বিজন কুমার ঘোষ

ভাদ্র মাসের দুপুর। হ্যাঁ, দুপুরই বলা চলে। বেলা সাড়ে তিনটের কড়া রোদ চারদিকে থইথই করে। এ সপ্তাহটা আমার সকালে ডিউটি। দশটা থেকে তিনটে পর্যন্ত। প্রত্যেক দিনই মিনিট পনেরো আগে বেরোবার চেষ্টা করি। এজন্য বস্‌কে একটা সিগারেট কি এক কাপ চা অফার করাই যথেষ্ট। বস্‌ খুশি হয়ে বলেন, আরে যাও যাও, তোমার আবার ট্রেনের টাইম।

ঠিক তিনটে দশে শিয়ালদা সাউথ ষ্টেশন থেকে ছাড়ে লক্ষ্মীকান্তপুর লোকাল। ভিড়টিড় তেমন একটা থাকে না। দিব্যি জানালার পাশটিতে বসি। ব্যস্ত কলকাতাকে পিছনে ফেলে বারো মিনিটের মধ্যে চলে আসি ঢাকুরিয়ায়।

সেদিন হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটে গেল। অফিসে কাজের চাপ ছিল। দিল্লীর এক উপমন্ত্রী পার্লামেন্টেই আচমকা হার্টফেল করে মারা গেছেন। খবরটা তাকে ধরিয়ে দিতে হবে যে কোন ভাবে। সুতরাং চা সিগারেট দিলেও ছুটি মিলবে না তা জানি। তাই বাজে খরচা না করে শেষ কপি নিয়ে তিনটে পনেরোয় অফিস থেকে বেরোলাম। পৌনে চারটের ছাড়ে ডায়মণ্ড হারবারের গাড়ি। দুনিয়ার ভিড় ওই গাড়িতে। কনিষ্ঠ কেরানীরা আগেভাগে অফিস থেকে ছুটতে ছুটতে এসে হাওেল ধরে। তার আগে অবশ্য পকেট থেকে থলে বার করে সস্তায় আনাজপাতি কিনে নেয়। হ্যারিসন রোড, বৌবাজার স্ট্রীটের ফুটপাথ তো তরকারি-ওয়ালীদের একচেটিয়া সম্পত্তি। বাবুরা ওদের প্রধান খদ্দের। কতবার ফুটপাথ সাফাই করা হয়েছে! কিন্তু দু'দিন বাদে

যে কে সেই। কংগ্রেসী আমলে হকাররা তেরঙা পতাকা আর মহাত্মা গান্ধীর ফটো নিয়ে অনশন শুরু করে দেয় জুলুমের প্রতিবাদে। বামফ্রন্টের আমলেও তাই। তবে তখন তেরঙা পতাকার বদলে আকাশে ওড়ে লাল ঝাণ্ডা আর মহাত্মা গান্ধীর বদলে কার্ল মার্কস।

যা বলছিলাম। আজ যেন গাড়িতে উপছানো ভিড়। তার ওপর প্রচণ্ড গরম। পাখা, বাল্ব ইত্যাদি জাতীয় সম্পত্তির যে যার নিজের অংশ বাড়ি নিয়ে গেছে। ফলে কামরার মধ্যে, কাগজের ভাষায়, পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। ট্রেনটার যেন কি হল আবার। গোটা পাঁচ-ছয় হুইসেল মেরে শেষে থির দিয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পনেরো মিনিট পর কি মনে করে আবার চলতেও লাগল। যাক, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। একবার চলতে আরম্ভ করলে ঢাকুরিয়া আর কতক্ষণ।

ভাদ্র মাসের বেলা যেন ফুরোতে চায় না। কি তেজ! তবে এর মধ্যেই আকাশটা ভাল রকমের নীল হয়ে গেছে। আর চব্বিশ ঘণ্টা দক্ষিণ থেকে গা জুড়োনো ফুরফুরে বাতাস। এবার সেপ্টেম্বরেই পুজো। ঢাকুরিয়ায় প্যাসেন্জারদের নামিয়ে দিয়ে ট্রেনটা এইমাত্র পিছলে গেল দক্ষিণে। আরে, এখানে কিসের ভিড়? এগিয়ে গেলাম। প্ল্যাটফর্মের চৌকো পাথরের পাশেই সবুজ ঘাসের জমি। সেই ঘাসের ওপর এক ভদ্রলোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। বয়েস সাতায় আটায় হবে। চোখে সরু ফ্রেমের চশমা। ইস্তিরী না করা আধ ময়লা ধুতি পাঞ্জাবী। গালে অন্ততঃ তিন চার দিনের জমানো দাড়ি। মৃগী নাকি? একজন চেঁচিয়ে উঠল, জুতোর শুকতলা শোঁকাও। আর একজন ধমক দিল, ওসব আন-সায়েন্টিফিক কাজ, তার চেয়ে ডাক্তার ডাকুন।

কয়েকজন জানতে চাইল, হঠাৎ এমন হল কেন? কি ব্যাপার? চেনেন নাকি?

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল, এই তো একসঙ্গে আমরা ট্রেন থেকে নামলাম। দু' পা এগিয়ে ভদ্রলোক হঠাৎ দুড়ুম করে পড়ে গেলেন। না না, আমি চিনিনা মশাই।

ভিড় ক্রমশ ফুলে উঠছে। ষ্টেশন মাষ্টার ইতিমধ্যে থানায় ফোন করে দিয়ে হাঁফাতে হাঁফাতে ছুটে এসেছেন। ষ্টেশনের কাছেই ডাক্তার বাগচীর

চেয়ার। ওকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসছিল। ডাক্তার বাগচী প্রথমে নাড়ী দেখলেন তারপর ষ্টেথিসকোপ বসালেন বুকে। শেষে ছোট কথাটি মুখ থেকে বেরিয়ে এল, এক্সপায়ারড। সঙ্গে সঙ্গে গোটা ভিড়টা চমকে উঠল। হায় হায় করে উঠল কেউ কেউ।

দেখুন তো ভাল করে কেউ চিনতে পারেন কি না।— একজন বয়স্ক ভদ্রলোক প্রাণপণে চেঁচালেন।

ভিড়টা সঙ্গে সঙ্গে ঝুঁকে পড়ল। খুঁটিয়ে দেখতে লাগল সব কিছু। আমিও এই সুযোগে আমার পরিচিত মানুষগুলিকে পরখ করতে লাগলাম। কিন্তু বৃথা। একজন বললেন, মনে হয় এদিকের কেউ না।

—নিশ্চয়ই এদিকের। এই দেখুন বাজারের থলে—।

সবার নজর এখন সেই দিকে। কতগুলি আলু ছড়িয়ে পড়েছে। একটা পাকা তাল। কিছু ঝিঙে, ঢেঁড়শ, একটা ছোট ঠোঙায় চানাচুর ভাজা। হ্যা, এগুলিই অকাট্য প্রমাণ তিনি চাকুরিয়ার বাসিন্দা। হতে পারে তিনি নতুন এসেছেন। বিশেষ কারও সঙ্গে পরিচয় হয়নি। হয়ত ডালহৌসি পাড়ার কোন অফিসের কেরানী। বাড়ী থেকে বেরোবার সময় হয়ত বৌকে বলেছিলেন, ভাদ্র মাস চলে যাচ্ছে, একদিনও তালের বড়া খেলাম না! ছোট মেয়েটাকে বলেছিলাম, তোর জন্যে চানাচুর ভাজা আনব শিয়ালদা থেকে। হায়রে, মানুষের জীবন! ছোট মেয়েটা হয়ত বারবার রাস্তার দিকে তাকাচ্ছে। বৌ তালচালুনি বেশ করে ধুয়ে ছাদে শুকোতে দিয়েছে। সব দিকেই ব্যবস্থা নিখুঁত। অথচ আসল মানুষটাই চলে গেল।

ইতিমধ্যে লোকজন অধৈর্য হয়ে উঠেছে। সবাই জানতে চায়, কে এই লোকটা? একজন পরামর্শ দিল, পকেটে নিশ্চয়ই মানিব্যাগ আছে, নামটা তাহলে বেরিয়ে যাবে।

—উঁহু। —ধমকে দিল একজন: আঠারো ঘা করবেন না। এক্ষুনি পুলিশ এসে যাবে। কি দরকার ওসব —

আমি চলে এলাম। কি হবে খামকা গবেষণা করে! মনটা বিষণ্ণ। চাকুরিয়া আর দশটা নোংরা ষ্টেশনের মতই রেল কাম ঝমাঝম। তবে কখন থেকে যেন একটা দুর্বলতাও বহন করে যাচ্ছি। কি করে যেন সেটা হয়ে গেল। প্রায় কুড়ি বছর চাকুরিয়ায় আছি। তখন কলেজে পড়তাম। আর

ঢাকুরিয়া ষ্টেশনটি ছিল দেখবার মত। সবুজ ঘাসে ঢাকা প্লাটফর্ম। কোথাও একটু নোংরা নেই। কু ঝিকাঝিক রেলগাড়ি কয়লার ধোঁয়া উড়িয়ে চলে যায় দক্ষিণে। আমরা সন্ধ্যের সময় সেই ঘাসে বসে আড্ডা দিতাম। কাছেই ছিল একটা শিউলী গাছ। পুজোর সময় অপরূপ গন্ধ ছড়াত গাছটা। যেন ষ্টেশন নয়, আমাদেরই ঘরবাড়ি। এত গা গুলোনো ভিড় ছিল না ট্রেনে। ওঠা নামাও ছিল কম। তারপর হঠাৎ যেন কি হয়ে গেল! তখন কলেজ ছেড়ে চাকুরীতে ঢুকেছি। আমরাও আর আগের মত সময় পাই না। কেউ কেউ বিয়ে-থা করে সংসারী হয়েছি। কয়লার বদলে এখন ইলেকট্রিক ট্রেন। প্ল্যাটফর্ম অনেক উঁচু করা হয়েছে। হঠাৎ লোকজন বেড়ে গেল। বাড়তে বাড়তে দু'ঘরের ফ্ল্যাটের ভাড়া দাঁড়িয়েছে চারশো টাকা। সেই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দক্ষিণের নিম্ন মানুষগুলি গোটা ষ্টেশনটাকেই ইজারা নিয়ে নিল। চালের চোরা কারবারী, ভিখারী, অন্ধ, খোঁড়া, পাগল, হাফ-পাগল, সমাজ বিরোধী—কি নেই? এখানে সেখানে দোকান গজিয়ে উঠল। একটু বেশি রাতের দিকে হাঁটাচলা করাই বিপদ। হাতের ঘড়ি কি কানের দুলের দিকে কালো হাত এগিয়ে আসতে কতক্ষণ! একবার তো আমি দারুণ বিপদে পড়ে গিয়েছিলাম। রাত তখন দশটা। শর্টকাট করতে ওভারব্রিজে উঠেছি, হঠাৎ দুটো মস্তান টাইপের ছেলে এগিয়ে এল।

—দাদা কোথায় যাবেন?

—ওদিকে যাব। কেন?

—একটু অসুবিধে আছে। আপনি প্ল্যাটফর্ম দিয়ে যান—

প্ল্যাটফর্ম থেকে ভ্যাবছা ভাবে আলো এসে পড়েছে। এক নজর বুলিয়েই বুঝতে পারলাম অসুবিধেটা কোথায়। সত্তার দেহদান পর্ব চলছে। কাজ হয়ে গেলে এঁরা যাবে, ওরা পাহারা দেবে তখন। নরক! নরক!! ছুটে পালিয়ে আসি। দেখতে দেখতে কি হয়ে গেল। জীবনের একটা চমৎকার সময় ঢাকুরিয়া ষ্টেশনে শ্রেফ আড্ডা দিয়েই কেটেছে। এখন তার নামে গায়ে জ্বর আসে। এখন শুধু অফিস যাওয়া এবং আমার কাজে ব্যবহৃত হয় ষ্টেশনটা। শিউলী গাছ কবেই মরে গিয়েছে। ষ্টেশনের দেওয়ালে ঘুটে দিয়েছে কারা। ফাঁকে ফাঁকে নোংরা রাজনৈতিক ইস্তাহার। বাড়ি ভাড়া, হলতে জমি বিক্রী, কি ঋতু বদ্ধে ঋতু উদয়ের টাটকা খবরও বাদ যায়নি।

আর একটা ব্যাপার সব চেয়ে বিরক্তিকর। ষ্টেশনে ঢুকলেই নাকে রুমাল চাপা দিতে হবেই। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার এমন নির্লজ্জ প্রতি-যোগিতা বুঝি ভূ-ভারতে নেই। একবার এমন ভাবে তরল পদার্থ ছড়িয়ে গিয়েছিল যে জুতো জোড়া ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে রিকশা করে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। নরক! নরক!!

হঠাৎ চমকে উঠলাম সেদিন। কোন কাজ ছিলনা অফিসে। নেহাৎ মামুলি খবর সব। রায়গঞ্জে বৃষ্টি হচ্ছে না, শিলিগুড়িতে ফুটবল খেলা দেখতে গিয়ে দুই যুবক আহত, দার্জিলিংয়ে এবার টুরিষ্ট কম, মেখলিগঞ্জে ধানের দর বৃদ্ধি—ইত্যাদি ইত্যাদি। অফিসে লোকজনও যথেষ্ট। মেজাজে ধোঁয়া ছেড়ে বস্ মশাই ছুটি দিয়ে দিলেন আমাকে। আমি চোখের পলকে শিয়ালদায়। দুটো পাঁচের ক্যানিং লোকাল সবে একটা হুইসেল দিয়েছে। সত্যি, তাড়াতাড়ি বাড়ি ফেরার মত আনন্দ আর আছে নাকি! এই সময় দুর্দান্ত রোদে ষ্টেশন চত্বরটা ভাজা ভাজা হয়ে যাবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। একখণ্ড কালো মেঘ সূর্যটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। ভারী সুন্দর একটা ছায়া ভেসে বেড়াচ্ছে চারদিকে। ট্রেনটা একেবারে ফাঁকা। আমার সঙ্গে দু'চার জনই নামল। যা বলছিলাম, অবাক হবার মতই ঘটনা। দিন কয়েক আগে একটা পাকা ভাল আর মেয়ের জন্যে চানাচুর ভাজা ঘাসের ওপর ছড়িয়ে যে ভদ্রলোক শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন, ঠিক সেখানে বসে রয়েছে এক জোড়া কপোত কপোতী। ঘন ছায়ার মধ্যে ষ্টেশনটা বারবার কেঁপে উঠছে ওদের হাসিতে। মেয়েটা এক একবার গড়িয়ে পড়ছে ছেলেটার গায়ে। ওর পরণে ঘন নীল বর্ণের শাড়ি। লাল টকটকে ব্লাউজ, ফরসা চেহারা—দারুণ মানিয়েছে। ছেলেটার গায়ের রং কালো। টিকলো নাক। পাজামা আর হলুদ রঙের গুরুপাঞ্জাবী। কতই বা বয়স ওদের। মেয়েটির সতের হলে ছেলেটি বড় জোর বাইশ। হয়ত দক্ষিণের কোন কলেজে পড়ে। আজ কিছুতেই মন বসেনি। পালিয়ে চলে এসেছে শহরে। আর আচমকাই ভাল লেগে গেছে এই ষ্টেশনটাকে।

সত্যি, চাকুরিয়ার কি সুদিন ফিরে এল নাকি? কত বছর বাদে যেন সেই রকম প্রাণজুড়োনো বাতাস উঠে আসছে আবার। কোথাও এক চিলতে রোদ নেই। শুধু ছায়া। ছায়াময়। কি একটা রসিকতায় মেয়েটি হাসছে হো-হো করে। দুপুরের নির্জন ষ্টেশনে তারই প্রতিধ্বনি।

নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে হয়। সত্যি অফিসে বসে থাকলে তো এই সুন্দর জিনিষটা অদেখাই থেকে যেত। হঠাৎ দুষ্টু বুদ্ধি জাগল। চুপি চুপি গিয়ে বলব নাকি, ওহে কপোত কপোতী, তোমরা যে জায়গায় বসে হি-হি করে হাসছ, তিনদিন আগে সেখানেই এক বুড়ো পটল তুলেছে। ওরা হয়ত এ কথায় চমকে উঠে একটু সরে বসবে। কিন্তু তাতে কি। সেখানেও তিন দিন না হোক, তিরিশ বছর আগে কেউ না কেউ মরেইছে। পৃথিবীটার বয়সও নেহাৎ কম হলনা। তার চেয়ে গল্পগুজব করুক ওরা। এই তো আর একটু বাদেই কোন ট্রেন আসবে। ওরাও চলে যাবে। কি দরকার ভয় জাগিয়ে! দৃশ্যটা আরও খানিকক্ষণ উপভোগ করতে আমি মেজদার দোকানে এক কাপ চা নিয়ে বসলাম।

নিসর্গ

শান্ত রায়

রহস্যময় দূরত্ব থেকে মানুষের প্রেম ও অভিযোগ, নিঃশব্দ অভিমান শুনেও
আকাশ অনন্তকাল শিশুদের নীলরঙ চেনায়

সোঁদাল গাছের ডালপালা ফুলে-ফুলে ভারী, গোল হয়ে
নুয়ে পড়েছে স্বপ্নিল
ফাঁক দিয়ে হঠাৎ ঠিক মাঝখানে মুখ বাড়িয়ে টু-কি
বলতেই ঝট্‌পট্‌ ক'রে পাখিরা ছড়িয়ে পড়লো চতুর্দিকে
প্রিয় বয়সের মজা আর স্বপ্ন মাথামুণ্ডুহীন, এই কাণ্ড
একটা দুষ্টু ছেলের,
তারপর লাঠি দিয়ে খুঁচিয়ে খানিকটা মাটি খুঁড়ে সে
খেয়ো কুকুরটাকে নিয়ে পড়লো
এমন সময় হাওয়ায় ভাসতে-ভাসতে এলো তুলোবীজ
লুকোচুরি খেলতে…
জষ্টিমাসে সারাবেলা আগুন ঘাড়ে নিয়ে দাঁড়ায় গাছেরা
ছুটোছুটি ক'রে ওদের আড়ালে এসে বসলে
কী আরাম!
বিকেলে বলখেলার মাঠের ধারে অদ্ভুত সবুজ হয়ে এলো
ওদের পাতা-টাতা
আর মাথার ওপর গুড়গুড় ক'রে বেজে উঠলো হুইসেল
তক্ষুণি শুরু হ'লো খেলা
বৃষ্টিতে খেলার মতো মজা নেই
খেলার পর চোদ্দটি ছোটো-ছোটো ছেলে
পুকুর তোলপাড় করলো

রাত্তিরে পাকের গন্ধ গা ছাড়েনা, সেই ঠাণ্ডা গন্ধে-গন্ধে
ঘুম এলো…

কুড়ি বছর পর ঘুমের মধ্যে সেই ঘ্রাণ
তার নাকে এসে লাগে
ভোরের হাওয়ায় চোখের পাতা নিবিড় হয়ে আসে
বউয়ের ও-পাশে বিছানায় হাত-পা ছুঁড়ে তাকায় তার শিশু
জানলার ওপার থেকে আকাশ তখন
শিশুটিকে নীলরঙ চেনায়।

গম

শ্যামলকান্তি দাশ

পোড়ায় আগুনে, জলে, খোঁচা দেয়, সারাদিন
নির্যাতন করে
গমগুলি এরকম, এরকমই ওদের স্বভাব—
সে বড় লাজুক, বোকা, আচাড়ুয়া ভীরু বাঘ,
মাথা-নিচু চোর,
মুখ ফুটে কিছুই বলে না, কিছুই বলার নেই তার—
মাঝে মাঝে বারণ মানে না খিদে
হাই ওঠে, ঘুম পায়, প্রবল খিদের তোড়ে
ছিঁড়ে যায় অপরূপ চোখ
নাম তাকে দুয়ো দেয়, কাছে টানে, গম কী ভীষণ ভাল লোক!

ক্ষয়ের প্রান্ত ধ'রে

হৃষীকেশ বিশ্বাস

চমৎকার এক ক্ষয়ের প্রান্ত ধ'রে ব'সে থাকি
ভোর থেকে ঘুরে আসে ফের এক ব্যর্থ কালো ভোর
আমার তীব্র আনন্দে পাকিয়ে যায় জট···
আমার সমস্ত প্রস্তুতি কে বিফল করে ?

দুই পাড়-মাতাল বলছিল : তুই আমায় খুন কর !
—তোকে কড়কড়ে একশ টাকা দেব—মাইরি—
আর একজন বলছিল না না না তুই আমায়
আগে খুন কর ! তোকে আমি কড়কড়ে
একশ টাকা দেব—ইল্লি—
তারপর সে কী ভয়ংকর হো হো হি হি হাসি—
তৃতীয় একজন পাড়-মাতাল কোণের টেবিলের থেকে
তাদের উদ্দেশে সংলাপ ছুঁড়ে দিল :
'শালা ! তোমাদের বাপ-মা দুজনকে
পুঁতেছিল
ভেবেছিল হবে দুই তুলসী গাছ
আর শেষকালে হ'লো কিনা,
দুই বিছুটি গাছ—

২

ওগো দৈত্যো ! ওগো ভোঁতা !
তোমার ভাষার খুরে নমস্কার ।
কাল থেকে আমি কোথাও যাবো না ।
ধন্যবাদ তোমাকে ধন্যবাদ তোমার কুকুরকে
চমৎকার দড়াম ক'রে বন্ধ হয়েছিল
তোমার ছ'ইঞ্চি সেগুন কাঠের দরজা ।
বরং আমি চাসা হব—তাদের সাদা অভ্যর্থনা
তাদের আপ্যায়ন ভাষা খুব ভালো ।

৩

বন্ধু বলেছিল : 'মানুষের সঙ্গে মিশতে শেখ'।
আমি বলেছিলাম ভালো লাগে না এতো ভেক
আমার তীব্র আনন্দে পাকিয়ে জট—
বরং যুদ্ধ চাই মুক্তি চাই।

৪

বাহ্, কী চমৎকার এই অন্ধকারের সৌরভ !
আরো চমৎকার
এই জ্যোতির্ময় রামরাজত্ব, ধ্বজা !
আমরা সব খাঁটি বরাহ-নন্দন—
প্রখ্যাত তরজা গায়ক ও কীর্তনিয়া
হায়, আপনারা এখনও কেমন পরস্পর
ভাব বিনিময় করছেন !

৫

ওগো শহীদের মা, তুমি তোমার খোকার জন্যে
কেঁদো না কেঁদো না
বেচারা পরলোকে খুব কষ্ট পায়
তোমায় যে খুব ভালোবাসতো—
কেমন রগড় করতো মাঝে মাঝে তোমার সঙ্গে
যেমন
তুমি যখন বলতে চার আনা ইলিশের গল্প—
কী রকম হেসে উঠে বলতো খোকা : তাহলে আজ
দুটো কোল-আঁটি আমায় দাও—তোমরা
তো অনেক খেয়েছো—আজ খেও না,
আর এঁ্যা!
সেই যেদিন খোকা শহীদ হ'ল—তুমি শুধু
ইলিশ নয় মাছ খাওয়া ছেড়ে দিলে—
ওগো শহীদের মা, তুমি কেঁদো না কেঁদো না
প্রতিশোধ নাও !
তুমি করলাবদনী হ'য়ে এক এক করে—

৬

প্রেম, বন্ধুতার জলে গন্ধক—
আর সমস্ত সৃষ্টি স্থিতিতে কী রকম এক ক্ষয় শূন্যতা—
আমার তীব্র আনন্দে পাকিয়ে যায় জট—
ভোর থেকে ঘুরে আসে ফের এক ব্যর্থ কালো ভোর
আমি তালের দৃশ্য—কালো আঁটির মতো
চমৎকার এক ক্ষয়ের প্রান্ত ধরে বসে থাকি
বসে থাকি—

[* শ্রদ্ধেয় কবি সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়কে]

তোমার নামে

অজিত বাইরী

তোমার নামে কোন শহীদ মিনার নেই
রাস্তার নাম বদলে রাখা হয়নি তোমার নাম
ব্রোঞ্জ কুঁদে উন্মোচন করা হয়নি তোমার আবক্ষ।
তুমি ছিলে এই শহরে, তোমার নিজস্ব শহর
তুমি ছিলে মিটিং-এ, মিছিলে, হরতালে
দেওয়ালে দেওয়ালে সেঁটেছো পোষ্টার, লাল স্লোগান।
তুমি ছিলে এই শহরে, তোমার নিজস্ব শহর
মিছিলের পুরোভাগে তুমি ছিলে, বুলেটে
বুক পেতে দাঁড়িয়েছো।
তোমার নামে কোন শহীদ মিনার নেই
রাস্তার নাম বদলে রাখা হয়নি তোমার নাম
ব্রোঞ্জ কুঁদে উন্মোচন করা হয়নি আবক্ষ।
তুমি আছো যেমন ছিলে মিছিলে মিছিলে, স্লোগানে, আগুনে
অগণিত মানুষের পদশব্দে শুনি না কি তোমারও পদশব্দ ;
রক্তে রাঙানো মানচিত্র যে বিশাল পদভারে কেঁপে ওঠে !

যজ্ঞ : আহুতি

মথুর দাস

অলীক হোমাগ্নি ঘিরে বসে আছে ছয়জন জ্যোতিষ্মর ঋষি
ওরা কেউ জানে না বেদ বেদান্ত কিম্বা শ্রীমদ্‌ভাগবত
সময়ের বীজমন্ত্র পেয়ে শরীর-বেদীতে
সমস্বরে ঢেলে দেয় ঘি
জকজকে বেড়ে ওঠে আগুনের শিখা···

জীবন ছাড়া এই যজ্ঞে আহুতি দেবার কিছু নেই ॥

বাঁশী বাজে বাঙলার বিখ্যাত বাঁশী

মাহমুদ কামাল

বাঁশী বাজে বাঙলার বিখ্যাত বাঁশী
কই বাঁশী তো বাজেনা
গ্রামের নতুন বউ নৌকোর ভেতর
নৌকোয় বাঁশী কেন এখন বাজেনা
রাখালের বাঁশী নাকি বিখ্যাত ছিল
বাঁশীর সুরে নাকি প্রেমিকার মনে
বৃষ্টির মতো কিছু কান্না ঝরে যেত
আজ কেন আকাশে বাতাসে বাঁশীটি বাজেনা।
বিপ্লবের আগে আমি বাঁশীটি বাজাবো
তারপর প্রেমিকা আমি তোমাকে সাজাবো।

• কবিতার শিরোনাম অগ্রজ কবি বুলবুল খান মাহবুবের একটি কবিতার প্রথম পঙক্তি থেকে ধার করা।

সময়

প্রণব পাল

তিনি আমার চোখের সামনে দিয়ে
ধেই ধেই ক'রে নাচতে নাচতে চলে যান।
থরথর বৃদ্ধের মতো সব কিছু দেখি,
অক্ষম শরীরে মাথা নাড়ি।
তিনি আমার হাতের চেটোয় উঠে
দাপাদাপি করেন। তবু তাঁকে ধরতে পারিনা।

এক অদ্ভুত পোষাকে তিনি আসেন।
যা পরলে তাঁকে দেখাই যায় না।
অথচ বোঝা যায়
উপলব্ধির উঠোন পেরিয়ে যাচ্ছে
তাঁর অদৃশ্য শরীর। এবং যাবার সময়
তিনি আমার মৃত পিতার মত দেখা দেন।
নিঃশব্দে বলেন,
"আমি চলে যাচ্ছি বাবা! আর ফিরব না।"

এইভাবে তিনি আমার চোখের সামনে দিয়ে
ড্যাং ড্যাং করে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছেন,
আমি থরথর রুগীর মতো নিঃসহায় বসে আছি।
এইবার
আমি শরীর থেকে খুলে রাখব বার্দ্ধক্যের চামড়া।
তাঁকে উলঙ্গ ক'রে দেখব তাঁর প্রবেশকালীন মুখ।
যা নিশ্চয়ই হবে
পৃথিবীর সদ্যোজাত শিশুটির মতো।

পুরনো বারুদ

পিনাকেশ সরকার

পুরনো বারুদ সব ভিজে গেছে অস্পষ্ট শিশিরে
গোপন আকাশ থেকে খসে পড়ে শুক্লাচাঁদ
ঘাসের আড়ালে পাতা তীব্র ক্ষুরে শিউরে ওঠে
সবুজ শামুক আকস্মিক ব্যথাবিহ্বল
ভিতরে ক্ষরণ তার নিত্যদিন, উপরে খোলস দায়ভ
কোথাও গন্ধক নেই, নেই বিচ্ছুরণ স্বপ্নবিকিরণ
গুহার গভীরে মৌন জল বহুকাল জমা
শব্দহীন প্রাণহীন আলোগন্ধস্পর্শহীন
পুরনো বারুদ সব ভিজে গেছে বিবর্ণ আঁধারে…

উড়ো চিঠি

বিজয়কুমার ভট্টাচার্য

আজ দুঃখের পাহাড় ছুঁয়ে নেমে এলো উড়ো জাহাজের থেকে
উড়ো চিঠি, টিলার বৈরিক রোদ একাকার ঘোলাজলে ছায়া ফেলে
দীর্ঘ দেবদারু
জলন্ত দিগার থেকে পুড়ে যাচ্ছে প্রধান সময়, তোমার
তর্জনী তাড়িত কাক সভয়ে জানায় ক্ষুরধার
শব্দ-মুখরতা
রুদ্রাক্ষ বনের ভেতর হাসির রহস্য রেখে প্রবণতাহীন
মানুষের স্থির অবয়ব
আজ দক্ষিণ বাতাসে উড়ো মেঘ, ক্রমশঃ আড়াল
করে ভগ্নকাচ হারিকেন বাতি, বোতাম ঘরের
থেকে মৃত্যুর কণিষ্ক হাত
ধীরে ধীরে খুলে দেয় বালিকার গোপনতাবোধ
আমি, উড়োজাহাজের উড়ো চিঠির থেকে ঝরে-পড়া
শব্দের মূর্খতা জেনেছি

ছায়া

কাশীনাথ দাস চাকলাদার

"এই তো এখানে আমি"
কে যেনো বলে বারবার ডাকে,
কিছুই দেখি না আর—
শব্দ শুধু কানে আসে ভেসে।
ছায়া ছায়া,
এইমাত্র দেখি সব সময় দেখি
দীর্ঘ জনাকীর্ণ রাজপথে।
কে কার সাথে থাকে,
ছায়া না আমি,
আমি না ছায়া।
"এই তো এখানে আমি,"
এইভাবে—
দিন কাটে সন্ধ্যে হয়
সন্ধ্যে কাটে দিন হয়।
ছায়া নিয়ে খেলা করি চিরকাল।

হে পিতামহ

রাজ রায়

আমার হাতের রাইফেল দেখে
ভয় পেয়ো না,
একে গাণ্ডীব ভেবে নিতে পারো।

হে পিতামহ, তুমি কি
ভীষণ তৃষ্ণার্ত?

দুর্বাসা ঘূর্ণি

কালোধন মুখোপাধ্যায়

পৃথিবী অন্ধকার
দুর্বাসা ঘূর্ণি
আকাশ বিদীর্ণ
আর্ত মানুষের হাহাকার
বাঁধভাঙা জননীর অশ্রুজলে
হৃদয়ের মর্মান্তিক ব্যথায়
চেয়েছিলাম···
সূর্যের বুক চিরে তাল-তাল
আলো এনে দিতে
পৃথিবীতে
কিন্তু·····পারিনি ॥

ঠাট্টা

অনুপকুমার আচার্য

সমুদ্রকে বলিনি, থামো—
তবু যেন লেগে থাকে নিঃস্বতার নোনা স্বাদ
গাছকে বলিনি তো, সরো—
দুঃখের বাচাল ফুল মিথ্যেই ঝরে যায় কতো
নারীকে বলেছি নাকি, ছাখো—
তবে কেন দ্রুত হাতে চোখ মুছে রুমাল ওড়াবে
রাজাকে বলিনি তো, শোন—
অনুতপ্ত চিঠি কেন অহেতুক ইনিয়ে বিনিয়ে
কাউকে বলেছি কখনো, কাঁদো—
তবে কেন নিরর্থক হেঁটে গেলে অর্থপূর্ণ হাসে।

মানুষ সেজেছি

মলয় সিংহ

জড়ো হতে হতে পাথর, ক্রমশ বেড়ে উঠে মিনার সেজেছে
অথবা তাকে সাজানো হয়েছে, ফুসফুসে রক্তের নালি
যেভাবে ছড়িয়ে থাকে ঠিক সেইভাবে শেকড় গেড়েছে সে।
মুখোশ আর পাথরের মাঝে মানুষের খেঁতলানো ছবি ঝোলে
কেউ বলে ওটা আমাদের পরিবারের ছবি।
এতদিন পরেও তুমি ছবিটি ঝুলিয়ে রেখেছ ?
শোন বালক, অবুঝ বয়স—কবরের পাশে সবুজ ঘাসের
শোভা কম নয়, তবু ভোলো ; ফিরেও তাকাতে বড়ো ভয় হয়
এখন মানুষ সেখানে ঘর ক'রে থাকে, বলে—
এই নাও প্রেমপত্র, বিষ অস্ত্র হাতে ; আমি মানুষ নই, মানুষ সেজেছি।

এখনো নদীর মতো

সলিল চক্রবর্তী

এখনো নদীর মতো মানুষের ভালোবাসা আছে।
আছে সেই কষ্ট পাওয়া, বুক ভেঙে কাছে—
খুব কাছে, বটের ছায়ার মতো পড়ে থাকা, আছে।

হাওয়া করতালি দেয় সোনালি রোদদুরে
এখন পাহাড়পুরে—
জ্যোৎস্নার অমল উদ্যান থিক থিক করছে।

কেবল বিষণ্ণতাই পারে শিল্পের মহিমবর্ণ এনে দিতে !

সহযাত্রী কই

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

সরল বালক তোর জল কই, পানকৌড়ি কই ?
হাতে তোর রক্তাক্ত ছুরির মত
ভাগ্যরেখাগুলি
তোর বিষণ্ণতা ছুঁয়ে ভেঙে দেয় কাম্য সহবাস।

সরল বালক তোর ঘর কই, গেরস্থালি কই ?
অথচ বাঁশের বেড়া বর্শার মতন হাসি মুখে
ঘিরে থাকে জমি জায়গা
সৈনিকের মত ক্লান্ত রোদে।
দিন যায়—দিন যায়—দিন গেলে বিনা প্রয়োজনে
রক্তে ক্রোধে ভ্রূণের ভিতর জাগে পল্লবিত শাখা
সরল বালক তোর ভেঙে যায় ভ্রষ্ট বিলাসিতা।

তবুও কে নির্বিরোধ সারাদিন একা একা বলে—
সরল বালক তোর সঙ্গী কই, সহযাত্রী কই···

তোমার অহংকার

শক্তি মুখোপাধ্যায়

আমি তো ইচ্ছে করে পরাজিত হয়েছি তাই তুমি
জয়ী হলে ; উৎসবের মালাগুলি শুকোবার পরে
দেখেছি তোমার চোখে ছায়া ফেলছে অশুভ দানব
যার নাম অহংকার ; আলো থেকে অন্ধকারে যে
নিয়ে যায় ভালোবাসা, বন্ধন, বিবেক, জয়টিকা !

পতন নিশ্চিত জেনে যারা মত্ত থাকে অহংকারে
জয়ী হয় তারা শুধু নিজেদের দৈন্যতার কাছে।
ওপরে উঠেছো নিচে ফেলে গেছো পুরনো খোলশ
তাই নিয়ে আমি আর খুঁজবো না স্মৃতির বন্ধন !

সুখের রাজ্যে গেলে সুখ পাওয়া যায় না মোটেই
দুঃখ যার রক্তে মিশে আছে বিষ কাঁটার মতন।
চিরস্থায়ী নয় কিছু, না ওপরে ওঠা, নিচে নামা
সুতরাং অহংকার আস্তাকুড়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে
শক্ত মাটিতে পা রাখো পুনরায়।

মা, তোমাকে

দেবাশিস প্রধান

মা, তোমার হাত আমাকে শাসিয়ে ছিল ?
কট্‌মটে তোমার চাউনি আমাকে নির্বাসন দিয়েছে
বিক্ষিপ্ত সমাজের বিষাক্ত ব্যাধির আশ্লেষে
শতধা বিভক্ত হয়েছে আমার ছিন্ন প্রজ্ঞা···

এও তো জানি মা, পাত্র ভেদে জলের বর্ণ অনেকানেক হয়
কিন্তু তোমার স্পর্শাতীত ভালোবাসা
সহনশীল মমত্ব একই একই আছে বিভিন্ন সময়ে !

মা, এই দুর্বিষহ দিনে
কি এক অনির্দেশ গোপনতম দুঃখে ম্রিয়মান হয়েছি আমরা।
তোমার স্নেহাঞ্চলের কাছে জমে আছে আজন্ম মৌনতা
তোমার স্পর্শাতীত ভালোবাসার কাছে জমে আছে আকণ্ঠ গরিমা
এই ঝড়-অন্ধকার খরা বন্যার আকালের নির্ঘুম বিপন্নতার
গভীর আঁধারে কুব্জ হইনি তোমাকে সামনে রেখে
শুধু নিথর রাতে আজীবন অন্তহীন নির্জনতার কাছে গাঢ় অভিমানে
মাথা নত করি
নতজানু হয়ে প্রার্থনা করি
আর একবার প্রাণ খুলে চেয়ে নাও মা,
সেই শাশ্বত চাওয়া আমাদের জন্যে
'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে ··' !

বৃত্তের কেন্দ্র

জ্যোৎস্নাময় বসু

উপন্যাস লিখতে বসে বিপদে পড়ে গেলাম। কত লোক যে ভীড় করে এসে গেল তার হিসাব করা মুস্কিল। পরিচিত, স্বল্প পরিচিত, অতি পরিচিত এমন কি প্রায় অপরিচিত অনেকেই এসে হাজির হয়েছে। সমস্বরে সবার এক কথা, আমি নায়ক হব। এই হবু নায়করা কেউ একা আসেনি। সঙ্গী বা সঙ্গিনী সবার সঙ্গেই আছে। অনেকে দলবল নিয়েও হাজির। হল্লা, চেচামেচি, দাবি, ধমক কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এত ভীড়ের মধ্যে নায়ক নির্বাচন করা সম্ভব নয়।

নায়ক হবার যোগ্যতা প্রমাণে প্রায় সবাই বদ্ধ পরিকর। কেউ কেউ তাদের নায়িকাদের যোগ্যতা প্রমাণেও ব্যস্ত। নায়িকাদের মধ্যে কেউ স্ত্রী, কেউ বান্ধবী, কেউ আত্মীয়া, কেউ বা পরস্ত্রী। জনকয়েক তো একাধিক নায়িকাও নিয়ে এসেছে। তাদের মধ্যে উপনায়ক খলনায়ক বা উপনায়িকাও যে নেই সে কথা হলফ করে বলা যাচ্ছে না। এত বিপদের কথা জানলে উপন্যাস লিখতে বসতাম না।

এই বিশৃঙ্খল অবস্থায় কিছু করা যাচ্ছে না। সম্ভবও নয়। আমার পক্ষে কাউকে বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। স্ব স্ব স্থানে সবাই নায়ক। কিন্তু আমার উপন্যাসে সবাইকে নায়ক করা সম্ভব নয়। এ মনোভাব ব্যক্ত করে আরো বিপদে পড়ে গেলাম।

অনেক বাকবিতণ্ডার পর সবাইকে কিছুটা শান্ত করা গেল এই অঙ্গীকার করে যে, সবাইকেই সুযোগ দেওয়া হবে। আশ্বাসের কথা এই যে বর্তমান উপন্যাসের চূড়ান্ত নায়ক নির্বাচন তারা আমার হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হল। সহজে কি আর

হয় ? অনেকে খেদ করে বলল যে, তারা নিজেরা লিখতে পারলে নিজেকে নায়ক করে এতদিনে বৃহৎ উপন্যাস লিখেই ফেলত। কেউ কেউ তো আমার মত স্বনামখ্যাত ঔপন্যাসিকের পরিচিত বলে উষ্মাই প্রকাশ করল। বলল যে—শঙ্কর, সমরেশ বা সুনীলের সঙ্গে তাদের পরিচয় থাকলে আমার মুখদর্শন করতেও তারা আসত না।

তা হোক, হবু নায়কদের মুখ দর্শন করা এতক্ষণে আমার পক্ষে সম্ভব হল। সবার মুখের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার সৃষ্ট ছোট গল্পের অনেক চরিত্রও এদের মধ্যে রয়েছে। এমন কি নাড়ুদা, মিনতি, অক্রুর, আজোয়ানী সাহেব, সুমিতা মায় রওশন আলি পর্যন্ত। এরা ছোট গল্পের প্রধান চরিত্র হলেও উপন্যাসের নায়ক তো হয়নি। অনেক বুঝিয়ে এদের বিদায় করা গেল।

ছোট গল্পের চরিত্রদের বিদায় করে ফিরে দাঁড়াতেই টাউয়ার মুখোমুখি হলাম। তার নাম অবশ্যই টাউয়া নয়, কি যে তার নাম তাও ভুলে গেছি। আমাদের কাছে সে টাউয়া বলেই পরিচিত ছিল। ছোটবেলায় সে ক কে ট বলে উচ্চারণ করত। একদিন একটা কাককে কুয়োর ভিতরে দেখতে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠছিল, মা, মা, দেখ—কুয়ার ভিতরে টাউয়াটা টা টা করছে। ব্যস, তারপর থেকেই তার নাম টাউয়া।

টাউয়া আমার বন্ধু না হলেও বন্ধু-স্থানীয় ছিল। একই পাড়ায় থাকতাম, এক সঙ্গে খেলাধূলা করতাম। আমাদের যোগসূত্র ছিন্ন হয়েছে বহুদিন কিন্তু তাকে দেখে তার বাড়ী থেকে পলায়নের কথা মনে পড়ে গেল।

বহু চেষ্টাতে দ্বিতীয়বারে ম্যাট্রিক পাশ করতে সক্ষম হলেও আই-এ পরীক্ষায় টাউয়া আর উৎরাতে পারেনি। সবটাই তার দোষ নয়। মায়ের পীড়াপিড়িতে ভালভাবে তৈরী হয়েই সে পরীক্ষায় বসেছিল। বই খাতা ইত্যাদি কোমরে গুঁজে পরীক্ষার হলে হাজির হয়ে দুদিন নির্বিঘ্নে পাশ করার মত পরীক্ষাও দিয়েছিল। তৃতীয় দিনে 'দেখেও-দেখতে-পান-না' এমন গার্ড এলেন না। কাজেই যা হবার তাই হল।

টাউয়া একা ছিল না, সঙ্গী হয়েছিল রতন এবং শ্রীনাথ। তিনজনে হল থেকে বেরিয়ে কিছুক্ষণ আস্ফালন করে চলে গেল চা-এর দোকানে। চা খেতে খেতে তারা একমত হল যে, পরীক্ষায় পাশ করা কোন কাজের কথা নয়। পরীক্ষার জন্য পড়া করে সময় নষ্ট না করে নিজেরা স্বাধীনভাবে মানুষ হতে পারে, এমন কি কেউ কেটাও হতে পারে। কত কেউকেটা ব্যক্তি পরীক্ষায় পাশ না করে কত কিছু করে বেড়াচ্ছে তার ছোটখাট একটা হিসাবও হয়ে গেল। কিন্তু এই ছোট সহরে তাদের

কদর কেউ বুঝবে না। কলকাতায় গেলে তারা অনেক কিছুই করতে পারে বলে সবাই একমত হল।

কলকাতায় এসে অনেক কিছু করার ইচ্ছা তাদের প্রবল থাকলেও এই অনেক কিছু তাদের কাছে স্পষ্ট হল না, বস্তুতপক্ষে অনেক কিছুর মধ্যে কোন্ কিছুটা যে করবে তাই মনস্থির করতে পারল না। এদিকে মা'র বাক্স হাতড়ে টাকা পয়সা যা নিয়ে এসেছিল তাও প্রায় ফুরিয়ে এল। কলকাতা শহর বড় নিরস কেউ দু মিনিটও তাদের কথা শুনতে নরাজ। এহেন শহরে কিছু হবার নয়, সময় নষ্ট না করে বোম্বাই যাওয়াই স্থির হল। কাজেই ভন্টু মানে বিনা টিকিটে বোম্বাইগামী রেলে চড়ে বসল।

প্রথমে ভয়ে ভয়ে থাকলেও যখন অনেকক্ষণ কেটে গেল তখন তারা মনের সুখে বাঙ্কে উঠে ঘুম লাগাল। মাঝ রাতে রায়পুরের কাছাকাছি এসে এক বেরসিক টিকেট চেকারের পাল্লায় পড়ে রায়পুর স্টেশনে বাকী রাতটা হাজতেই ঘুমাতে হল। সকালবেলা তাদের ট্যাকের পরিমাপ করে রেল-দারোগা গোটাকয়েক মোক্ষম গালি দিয়ে হাজত থেকে তাদের বিদায় করে দিল। বেফয়দা ঝুট ঝামেলা তার একেবারেই পছন্দ নয়।

রায়পুর শহরে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে একটি বাড়ীর নেম-প্লেট দেখে তিনজনেই উৎসাহিত হয়ে উঠল। উমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় নামটা তাদের আকর্ষণ করল। ইনিয়ে বিনিয়ে দুচার কথা বলার পর সেখানে শুধু খাওয়া দাওয়া এবং সেদিনকার মত আশ্রয়ই মিলল না চাকুরীও জুটে গেল।

উমাপতিবাবু কাঠের ব্যবসা করেন। জঙ্গল ইজারা নিয়ে গাছ কেটে বাইরে কাঠ চালান দেন। এদের উপর জঙ্গলের কাজ দেখাশুনার ভার পড়ল। ইজারা নেওয়া গাছের হিসাব, সেগুলি কাটবার তদারকি, লরির হিসাব ইত্যাদি তাদের কাজ। বিনিময়ে থাকা খাওয়া ছাড়া একশ টাকা করে মাইনে। কৃতজ্ঞ চিত্তে তারা উমাপতিবাবুকে প্রণামই করে ফেলল।

দিন পনের কাজ করার পর টাউয়ার মাথায় এই প্রশ্ন এল যে, এই দণ্ডকারণ্য জঙ্গলে পড়ে থাকবার জন্যই কি তাদের জন্ম হয়েছিল? নাকি এখানে থাকলে কেউ তাদের কদর বুঝতে পারবে?

কাজেই উমাপতিবাবুর উপদেশ উপেক্ষা করে পনের দিনের মাইনে এবং বোম্বাই যাবার রেলভাড়া উপরি হিসাবে আদায় করে আবার তারা সেই একই ট্রেনে ভন্টুটি ভ্রমণে প্রবৃত্ত হল।

বোম্বাই পৌঁছাতে এবারে আর অসুবিধা হয় নি। এই পনের দিনে তাদের চেহারাও কিছুটা দুরস্ত হয়েছিল। স্টেশন প্ল্যাটফরম থেকে বেরোবার পন্থাও টাউয়াই আবিষ্কার করল। তাদের যৎসামান্য মালপত্র রতন ও শ্রীনাথের জিম্মায় রেখে টাউয়া একটা লুঙ্গি এবং ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে নানা অঙ্গভঙ্গি করে প্ল্যাটফরমের এপাশ ওপাশ ঘুরে বেড়াল এবং অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে একসময় একটা বেঞ্চিতে বসে 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি' জাতীয় কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই একজন রেল পুলিশ তার এখানে বসে থাকার হেতু জিজ্ঞেস করতে টাউয়া তার মুখে থু থু ছিটিয়ে দিল। ব্যস, এতেই কার্যোদ্ধার। রেল পুলিশ দু চারবার হাতের সুখ করে টাউয়াকে গলাধাক্কা দিয়ে প্ল্যাটফরমের বাইরে বের করে দিল তারপর সে তিনটা প্ল্যাটফরম টিকিট কিনে বুক ফুলিয়ে রতন ও শ্রীনাথকে বার করে নিয়ে এল।

বোম্বাইতেও রায়পুরের কায়দা কাজে লেগে গেল। মৈত্র মশাই-এর বাড়ীতে স্নান খাওয়া ও ঘুম সেরে সন্ধ্যায় তার সঙ্গে বেঙ্গলী ক্লাবে চলে এল। সেখানেই তাদের থাকবার ব্যবস্থা হল এবং বিভিন্ন বাঙ্গালীর বাড়ীতে তাদের খাবারও রুটীন তৈরী হয়ে গেল। বোম্বাই শহর যে তাদের কদর বুঝতে পেরেছে এতে তারা যৎপরনাস্তি খুশীও হল। সারাদিন ঘুরে বেড়িয়ে বা শুয়ে বসে রুটীন মাফিক খাওয়া দাওয়া সেরে সন্ধ্যায় ক্লাবে তাস পিটে তাদের সময় ভালই কাটছিল। চাকরীর চেষ্টা করার ধারে কাছেও গেল না। কিন্তু বোম্বাই শহরও তাদের ভার বেশীদিন সইতে নারাজ হল। মাস তিনেক পর তাদের খাবার রুটীন বন্ধ হল এবং থাকবার অন্য ব্যবস্থা করার নোটিশ জারী হল।

রতন এবং শ্রীনাথ আর নতুন করে ঝুঁকি নিতে রাজী হল না। তিনজনে সেদিনই রিক্রুটিং অফিসে চলে গেল। যুদ্ধ শেষ হলেও তখনও রিক্রুটিং মোটামুটি ভাল ভাবেই হচ্ছে। দুদিনের মধ্যে তারা ভর্তি হয়ে গেল এবং দিল্লি ক্যান্টনমেন্টে যাবার রেলওয়ে ওয়ারেন্টও পেয়ে গেল। দিল্লী আসতে আসতে টাউয়ার মত বদলে গেল। মিলিটারীতে যোগ দেবার মানসিকতার অভাবে হোক বা বহুদিন ঘরছাড়া বলেই হোক সে লাহোরে মামার কাছে যাওয়াই স্থির করল। দিল্লী স্টেশনে রতন ও শ্রীনাথের সঙ্গে তার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

লাহোর স্টেশনে নেমে টাউয়ার মত ছেলেও ঘাবড়ে গেল। তখন শহরে ভীষণ দাঙ্গা হাঙ্গামা চলছে। টাউয়া স্টেশনের বাইরে যেতে সাহস করল না। স্টেশনে

কাটিয়ে দিল দিন চারেক হাতে প্রাণ নিয়ে মিলিটারী পাহারা থাকা সত্ত্বেও। মামা মিলিটারি অফিসার। দু একজন জওয়ানকে জিজ্ঞেস করেও তার হদিশ করতে পারল না। তার ভাগ্য ভাল বলতে হবে, চার দিনের দিন মামাকেই স্টেশনে পেয়ে গেল। তিনি কার্যোপলক্ষ্যে সেখানে এসেছিলেন।

মামার বাড়ীতে যে চেহারা নিয়ে টাউয়া সেদিন ঢুকেছিল তা দেখে সবাই আঁতকে উঠেছিল। যাই হোক, মামার কাছে কিছুদিন থাকতে হল। সেখানে তার মামাতো বোন উমার সঙ্গে বেশ ভাব হয়ে গেল। উমা তখন ইস্কুলে উঁচু ক্লাশে পড়ে।

তার পরের ইতিহাস আমার বিশেষ জানা নেই। এটুকু জেনেছিলাম যে, বছর কয়েক পরে টাউয়া উমাকে বিয়ে করে কলকাতায় বসবাস করে। উমা বি. এ. এবং বি. টি পাশ করে ইস্কুলে চাকরী করে আর টাউয়া উমার অনুপস্থিতির সময় ছেলে মেয়েদের দেখা শোনা করে আর সন্ধ্যাবেলায় তাস পিটিয়ে দিন কাটায়।

টাউয়াকে আমার বর্তমান উপন্যাসের নায়ক করা সম্ভব নয়। তাকে বিদায় করতেই দেখি রামবাবু নিজে থেকেই চলে যাচ্ছেন। রামবাবুর কথা বিশেষ বলার নেই। তিনি খুবই সাধারণ ঘরের অসাধারণ ছেলে। বিয়ের পর তিনি চাকরীতে ইস্তফা দেন। জিজ্ঞেস করাতে তার সাফ জবাব হল যে, কালো স্ত্রীর জন্য কষ্ট করে সে চাকরী করতে রাজী নয়। রামবাবুর সংসার কিভাবে চলছে জানি না কিন্তু এটা জানি যে তার চারটি ছেলে মেয়ে হয়েছে এবং তারা বড়ও হচ্ছে। এহেন রামবাবু বিদায় নিলে আমি বাধা দেবার কে?

মুস্কিলে পড়ে গেলাম পচাদাকে নিয়ে। একে আমি বড় ভয় পাই, আমার হাত-পা শিউরে ওঠে। একে চট করে বিদায় করাও সম্ভব নয়। অল্প কয়েক বছরের জন্য আমি পচাদাকে দেখেছি কিন্তু সে কবছরে কত বিচিত্র ঘটনা ঘটতে দেখেছি এই পচাদাকে নিয়ে।

তার সঙ্গে আমার পরিচয়—ঢাকা শহরে। তিনি রেডিও-আর্টিষ্ট, পরোপকারী এবং অমায়িক ভদ্রলোক ছিলেন। এসব কথা মেনেও তাকে আমার ভীষণ ভয় করে। তার মুখোমুখি হয়ে কখনও আমি ভয় পাইনি কিন্তু তার কথা ভাবতেই আমার ভয়। এখানেও দেখুন তিনি বিনয়ের অবতার হয়ে বসে আছেন। এখনই হয়ত আমি তাকে আমার বর্তমান উপন্যাসের নায়ক নির্বাচন করে বসব। কয়েকটি ঘটনা সাজিয়ে দিলে বোধ হয় জিনিষটা খোলসা হবে।

আগেই বলেছি তিনি ছিলেন রেডিও শিল্পী। ঢাকায়—তখন নতুন রেডিও

ষ্টেশন স্থাপিত হয়েছে। পচাদা ছিলেন তার একজন অন্যতম প্রধান শিল্পী। তিনি পল্লীগীতি এবং রাগ সঙ্গীত দুটোতেই পারদর্শী ছিলেন। দুটো বিভাগে যুক্ত ছিলেন বলে অন্যান্য শিল্পীদের তুলনায় তিনি অনেক বেশী প্রোগ্রাম পেতেন। সেইজন্য নাম ডাকও ছিল বেশী। সেই পচাদা যখন আমাদের বাড়ীতে আমার ছোটবোনের গানের শিক্ষক নিযুক্ত হলেন তখন গর্বে আমার বুক ফুলে অন্তত ইঞ্চি দুয়েক বর্ধিত হয়েছিল।

গান আমি ভালবাসতাম. পচাদা যতক্ষণ গান শেখাতেন আমি সেখানে উপস্থিত থাকতাম এবং মনে মনে যতটা সম্ভব শিখে নিতাম। এই পচাদা যখন প্রথম দিন একটু পরেই আমাকে শিবুদা সম্বোধন করে পান চাইলেন আমি তখন যেন স্বর্গ হাতে পেয়েছি বলে মনে হল। তারপর মা চা পাঠিয়ে দিলে আমি আর একবার পান এনে দিতাম। অতি তুচ্ছ প্রয়োজনে পচাদা আমাকে শিবুদা বলে সম্বোধন করতেন।

কিছুদিন এভাবে চলার পর বাড়ীর সবার সঙ্গেই পচাদার হৃদ্যতা জন্মাল। বাবার সঙ্গেও তিনি বিনয় সহকারে অনেক কথা বলতেন। এই কথার মধ্যেই একদিন বাবা জানালেন যে, চিত্তরঞ্জন কটন মিলের কিছু শেয়ার তিনি সস্তায় কিনেছেন কিন্তু ডিভিডেন্ট খুব কম পাচ্ছেন। পচাদা কথাটা মন দিয়ে শুনে আক্ষেপ করলেন এই বলে যে, বাবা এত ভুল কেন করলেন। ভাল কোন কোম্পানীর শেয়ার কেনা উচিত ছিল। কয়েকদিন পর বাবাকে জানালেন যে চিত্তরঞ্জন কটন মিলের অবস্থা খুব খারাপ হয়ে পড়েছে এমনকি যে কোন দিন কোম্পানী লাটে উঠতে পারে। সেই ক্ষেত্রে শেয়ারের কোন মূল্যই থাকবে না। বাবা ঘাবড়ে গেলেন। ফলে বাবা চিত্তরঞ্জনের সব শেয়ার বিক্রী করে সেই টাকায় উচ্চমূল্যে কুমিল্লা ব্যাঙ্কিং এর শেয়ার কিনলেন, অবশ্যই পচাদার মারফত। কার কাছে শেয়ার বিক্রী করলেন বা কার কাছ থেকে কিনলেন সেকথা বাবা নাম দুটো ছাড়া আর কিছুই জানলেন না।

এঘটনার পর পচাদা প্রায়ই নাগা করতে লাগলেন। গড়ে মাসে একদিন করে আসতে লাগলেন। কাজেই বাবা তাকে রেহাই দিলেন। পচাদা হৃষ্ট চিত্তে গানের শিক্ষকের কাজ ছেড়ে দিলেন কিন্তু আমাদের সঙ্গে হৃদ্যতা আগের মতই বজায় রইল।

ঢাকায় প্রায়ই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা লেগে থাকত। পচাদা সে সময়

অনেক উপকার করতেন। একদিন আমার খুড়তুতো ভাইকে কারফ্যু আইন ভঙ্গ করবার অপরাধে পুলিশ রাস্তায় গ্রেপ্তার করে। পচাদা নিজের বাড়ীতে বসে সে ঘটনা দেখতে পেয়ে দরজাতে চলে এলেন। পুলিশ তার বাড়ীর কাছাকাছি আসতেই পচাদা সেই কনষ্টেবলকে দারোগা সাহেব বলে সম্বোধন করে জিজ্ঞেস করলেন —

– দারোগা সাহেব, বিষ্ণুরে ধরলেন কেন ?

- ওরে চিনেন নাকি ?

—চিনি না ? বড় শয়তান পোলা।

—দেখেন না, কারফ্যুর মধ্যে রাস্তায় ঘুইরা বেড়ায়।

—এই শয়তান পোলাগো নিয়া আমি আর পারি না। বুঝলেন দারোগা সাহেব, অগো আমি কত যে কই বালো অইয়া থাকবি, আইন মাইনা চলবি। কথা কি শোনে ? এই পোলাগুলার শাস্তি পাওয়াই উচিত, বুঝলেন দারোগা সাহেব।

এই কথা বলে পচাদা বিষ্ণুকে লাগালেন এক চড়। তারপর বিস্তর গালাগাল দিয়ে বিষ্ণুকে বাড়ীতে যেতে বললেন এবং আর কোনদিন কারফ্যু আইন ভঙ্গ করতে মানা করলেন।

দারোগা সাহেব পচাদার এত রাগ দেখে কোন কথাই বলতে পারলেন না। বিষ্ণু হেঁটে চলে গেল নিজের বাড়ীতে। বিষ্ণু যতক্ষণ বাড়ীর ভিতরে না ঢুকেছে ততক্ষণ পোলাগুলির উদ্দেশ্যে পচাদা বিস্তর রাগ দেখাতে লাগলেন এবং আর কোনদিন এমন আইনভঙ্গ করলে যে তিনি তাদের আর আস্ত রাখবেন না সে কথাও জানিয়ে দিলেন। বিষ্ণু বাড়ীতে গেলে পচাদা আর কথা বাড়ালেন না। দারোগা সাহেবের সঙ্গে পুনরায় মিলিত হবার বাসনা ব্যক্ত করে দরজা বন্ধ করে দিলেন।

এ ধরনের আরো অনেকের উপকার করতেন পচাদা। একবার তো থানায় গিয়ে কেঁদে কেটে আমার ছোট ভাইকে বিধবা মায়ের একমাত্র সন্তান বলে পরিচয় দিয়ে ছাড়িয়ে নিয়ে এলেন।

দাঙ্গার সময় বাজার প্রায় বন্ধই থাকত। কেই বা মাছ খাবার লোভে প্রাণ হারাতে রাজী ! কদিন মাছ না খেতে পেয়ে সেটাই প্রধান আলোচনার বিষয় হয়ে উঠল। একদিন সকালে পচাদা আমাকে নিয়ে ট্রেনে চেপে নারায়ণগঞ্জ এলেন। সেখানকার বাজার তখন রমরমা। নিজেদের প্রয়োজন মত মাছ কেনা হয়ে গেলে পচাদা প্রস্তাব করলেন যে পাড়ার অন্যান্যদের জন্যও কিছু মাছ কেনা হোক। আমি

আর কি বলব! তিনি দশ আনা দিয়ে প্রায় আধ ঝুড়ি কুচো চিংড়ি কিনলেন। মাছের দাম সম্বন্ধে কিছু বলতে আমাকে মানা করে দিলেন। আমরা দুজনে যখন ফিরে আসি রাস্তায় অনেকেই মাছের কথা জিজ্ঞেস করলেন এবং তাদের কিছু দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। পচাদা সবাইকে জানালেন যে নারায়ণগঞ্জে মাছ বড় আক্রা। ঢাকা সহরের বহুলোক সেখানে বাজার করতে যায় বলে সব জিনিষের দাম আগুন, প্রায় ধরা ছোঁয়ার বাইরে। একবার বাড়ীতে এসে তারা দেখতে পারেন যদি কিছু দেওয়া যায়।

পচাদার বাড়ীতে বেশ ভীড় জমে গেল। চিংড়ী মাছের দাম শুনে অনেকে পিছিয়ে গেলেন। জন কয়েক সে দামেও কিনতে রাজী। পচাদা সেই মাছ আটভাগ করে আর একভাগ নিজের জন্য রেখে বাকী ছয়ভাগ বাকী ছয় জনকে দিলেন প্রত্যেকের কাছ থেকে পাঁচ আনা করে আদায় করে কারণ পচাদা সেইমাছ আড়াই টাকায় কিনেছেন বলে আগেই জানিয়ে দিয়েছেন।

পচাদার আর এক কীর্তি ব্যাঙ্ক স্থাপন করা। পশ্চিম ধলার জমিদার আমাদের পাড়াতে বাস করতেন। জমিদারী বিক্রী করে কিছু কাঁচা টাকা তার হাতে এসেছিল। তাকে ম্যানেজিং ডাইরেক্টর করে পচাদা নিজে ডেপুটী ম্যানেজিং ডাইরেক্টর হয়ে ছোটখাট অনুষ্ঠানের মারফত পশ্চিমধলা ব্যাঙ্ক স্থাপন করলেন।

পচাদা রেডিও শিল্পী বলে অনেকের কাছ থেকে খাতির পেতেন। কাজেই অনেকে সেখানে একাউন্ট খুললেন। আমাকে দিয়েও একদিন দশ টাকার একটা একাউন্ট খোলালেন। সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে সুন্দর সুন্দর চেয়ার এবং কাউন্টার খুলে ব্যাঙ্ক মোটামুটি জমজমাট হয়ে উঠল। পচাদা বিড়ি ছেড়ে সিগারেট খেতে শুরু করলেন।

একদিন দেখা গেল পশ্চিমধলা ব্যাঙ্কের সাইন বোর্ড আর নেই। বাড়ীটায় বিশাল তালা ঝুলছে। ব্যাঙ্কের সামনে ভীড় জমে গেল। প্রচুর উত্তেজনা কিন্তু সেখানে ব্যাঙ্কের কোন লোককে পাওয়া গেল না। শেষ পর্যন্ত পুলিশ আসাতে বাড়ীটা বেঁচে গেছে। একাউন্ট হোল্ডাররা তারপর খুঁজে পেতে সেই জমিদারের বাড়ীতে গিয়েও দেখল তালা ঝুলছে।

একদল পচাদার বাড়ীতে হাজির হয়েছিল। তারা সেখানে গিয়ে যে দৃশ্য দেখতে পেল তাতে পচাদার উপর রাগ তো করলই না বরং সবাই আহা-উহু করে ফিরে এল। পচাদা বারান্দায় বসে নিজের চুল ছিঁড়ছেন আর চিৎকার করে আক্ষেপ

করছেন যে তার সর্বনাশ হয়ে গেছে! পশ্চিমধলা তাকে ভাতে কাপড়ে মেরে গেছে! একাউন্ট হোল্ডারদের শুধু টাকার লোকসান; পচাদার সর্বস্ব তো গেছেই তাছাড়া তার মান সম্মান প্রতিপত্তি মায় পুরানো চাকরী পর্যন্ত চলে গেছে! পচাদার কথা শুনে এবং তার অবস্থা দেখে পচাদার দুঃখে সবাই দুঃখিত হয়ে চলে গেলেন। কাজেই পচাদা কিছুদিনের মধ্যেই আবার অমায়িক হয়ে উঠলেন।

আরো অনেক ইত্যাকার ঘটনা পচাদাকে নিয়ে বলতে পারি কিন্তু এ-সব তুচ্ছ ঘটনা। এসব ঘটনার কথা হয়ত আমার মনে কোন দাগই কাটত না। একদিনের ঘটনা এমন দাগ কেটেছে যে এসব তুচ্ছ ঘটনার কথাও ভুলতে পারিনি।

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে শুনতে পেলাম পচাদার স্ত্রী মারা গেছেন। শুনে আমি ছুটে গেলাম। পচাদার বাড়ীতে বৌদির হাতের চা অনেক খেয়েছি। ভাল মানুষটি, সংসার নিয়ে থাকেন, সৎ মেয়েকে যত্ন-আত্তি করেন। বৌদি পচাদার দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী ছিলেন। প্রথম স্ত্রীর কথা আমি জানিনা, তাকে দেখিনি, তার কথা কখনও শুনিনি।

পচাদার ঘরে সেদিন বৌদিকে দেখে মনে হয়েছে যেন তিনি ঘুমিয়ে আছেন। পাশে পচাদা বসে আছেন, গভীর দুঃখে অন্যমনস্ক হয়ে। বৌদি রাতে নাকি একবার শুধু বলেছিলেন যে, তার শরীর খারাপ লাগছে। সকালবেলা তাকে জাগাতে গিয়ে পচাদা বুঝতে পারেন যে তার স্ত্রী মৃত।

আমরা যখন সৎকারের জন্য বৌদিকে তুলে নিতে গেছি তখন পচাদা একেবারে হাউমাউ করে কেঁদে ফেললেন। তারপর ঠিক তুলবার আগের মুহূর্তে কান্নার মধ্যে একবার গয়নাগুলির কথা উল্লেখ করলেন। আমরা সেগুলি খুলে পচাদার মার হাতে দিয়েছিলাম।

এ ঘটনার চার মাস পর অনাড়ম্বরে পচাদা আবার বিয়ে করলেন। নতুন বৌ খুব সুন্দরী এবং স্বাস্থ্যবতী। পচাদারই গানের ছাত্রী। তারপর শুনতে পেয়েছি যে বেশ কিছুদিন ধরে এ মেয়ের সঙ্গে পচাদার ভাব চলছিল।

তারপর আর পচাদার কথা শুনিনি। কিন্তু তার কথা মনে হতেই আমাকে একটা ভয় পেয়ে বসে। যাই হোক এসব ভাসা ভাসা ঘটনার উপর ভিত্তি করে পচাদাকে আমার বর্তমান উপন্যাসের নায়ক করা যায় না। তাকেও বিদায় করলাম।

এতজনকে সামলাতে আমার ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। তখন লালমোহন এক কাপ

চা আমার সামনে রাখল। খুব ভাল লাগল আমার। ঠিক এই সময়ে এক কাপ চায়ের বড় প্রয়োজন ছিল।

চা খেতে খেতে বীণাদিকে দেখলাম একপাশে বসে আছেন। সঙ্গে এক বৃদ্ধ প্রায় অথর্ব। বীণাদির স্বামী। বীণাদি যাকে বলে মুখে সোনার চামচ নিয়ে জন্মেছিলেন। রায় বাহাদুরের নাতনী। কিশোরী বীণাদি শহরের বহু উচ্চ শিক্ষিত ধনীমান যুবকের ঘুমের ব্যাঘাত ঘটাতেন। উচ্ছলা, চঞ্চলা, সদা হাস্যময়ী বীণাদি এইসব যুবকদের দিকে একবারও ফিরে তাকাতেন না।

থাকতেন রেঙ্গুনে। সেখানে কাঠের ব্যবসায়ী মোহনদাকে বিয়ে করে আনন্দে দিন কাটাচ্ছিলেন। এল যুদ্ধ, পালিয়ে চলে এলেন ঢাকায়। সেখানে মোহনদা নতুন করে ব্যবসা শুরু করেছিলেন—মিলিটারী সাপ্লায়ার। শুরু করেছিলেন বটে কিন্তু এল দেশ বিভাগ। পালিয়ে এলেন কলকাতায়। কলকাতায়ও মোহনদা ব্যবসা করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু মূলধন গত দুবারের বিপর্যয়ে শেষ হয়ে যাওয়াতে সুবিধা করতে পারেন নি। অল্প বয়সে মোহনদা বৃদ্ধ হয়ে গেলেন। বীণাদি বহু কষ্টে সংসার চালাচ্ছেন। এদের কথা রং চড়িয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে লিখলে একটা উপন্যাস হয়ত হতে পারে কিন্তু এভাবে লেখার উদ্দেশ্য আমার না। বীণাদিকেও বিদায় দিলাম।

রেঙ্গুনের সুধাদিও তার বড় মেয়েকে সঙ্গে করে বীণাদির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন। সুধাদির কথা ভোলবার নয়। যেভাবে রেঙ্গুনে পুরো যুদ্ধকাল তিনি কাটিয়েছেন সে এক কাহিনী। সে কাহিনীর অনেকটা আমার জানা কিন্তু তার পরের ঘটনা আমার জানা নেই। সুধাদিকে নিয়ে একটা কাহিনী লেখা যায় কিন্তু উপন্যাসে তার স্থান কোথায়?

কিছু লোক বিদায় হলেও এখনও বহু রয়ে গেছে। অমিত, বিনয়দা, বিজয়া, চৌধুরী, ছোট বৌ, কালোপিসী, লিলিমাসী, সুরেশ, ক্রীষ্টা, জুলিয়া, ডাক্তারবাবু ইত্যাদি এখনও অনেকে হাজির রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে যে বাদ দেব সে কথা ভাবতে পারছিলাম না। এদের অনেককে নিয়ে আমার লিখবার বাসনাও আছে, কিন্তু কাকে নিয়ে শুরু করব? এসব কথাই ভাবছি এমন সময় লালমোহন আবার এসে হাজির হল।

—বাবু, মালতি কিছু বলতে চায়।

—তা, এখানেই নিয়ে আয়।

এই লালমোহন আমার বাড়ীতে কাজ করে। একাধারে সে বাজার সরকার, রান্নার বামুন, এবং সংসারে টুকিটাকি আর সব কাজের এবং ফাই-ফরমাস খাটবার লোক। লালমোহনের রান্নার হাত বড় ভাল। হোটেল বা অন্য কোথাও খেয়ে সেই জন্য আমি সুখ পাই না। বাড়ীর খাওয়া পেলেই আমি তৃপ্ত। চিংড়ীমাছ দিয়ে পুঁইশাকের তরকারী লালমোহনের হাতে বড় ভাল হয়।

লালমোহনের বাড়ী মেদিনীপুর জেলার এক গণ্ডগ্রামে। নামটা একবার শুনেছিলাম কিন্তু মনে রাখবার প্রয়োজন বোধ করিনি। দেশে স্ত্রী পুত্র পরিবার সবাই আছে আর আছে যৎসামান্য ধানের জমি। লালমোহন সেজন্য দুবার দিন কয়েকের জন্য ছুটি নেয় এবং তখন সে মাইনের টাকা পয়সা নেয়। বাকী সময়ে কোন টাকা পয়সা নেয় না।

দুবার ছুটিতে গিয়ে যে অমানুষিক খেটে আসে তা তার চেহারায় বেশ ফুটে থাকে। ধানবোনা এবং ধানকাটা চাট্টিখানি কথা নয়। মাঝে মাঝে মনে হয়, লালমোহন বেশ আছে ভাল। নিজের খাবারের জন্য ভাবতে হয় না, পরিবার পরিজনের উপর বিশেষ দায়দায়িত্ব নেই, মালতীর সঙ্গে গল্পগাছা করে দিনগুলি বেশ ভালই কাটাচ্ছে।

মালতী আমার বাড়ীতে ঘর ঝাট দেয় বাসন ধোয় আর কাপড় কাচে। ঠিকা ঝি। সকাল বেলায় চা রুটি আমার এখানেই খায় মালতীর বাবা দেশবিভাগের পর এপারে এসে অনেকের সঙ্গে কসবার বস্তীতে থাকে। মালতীর স্বামী কাজ করে এক ডেকরেটারের সঙ্গে। চাকরী বাঁধা হলেও রোজ কাজ পায় না। যে কদিন ডেকরেটরের কাজ থাকে সে কদিন সে কাজ পায়। মালতী সেজন্য সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চার বাড়ীতে কাজ করে। প্রত্যেকের বাড়ীতে দুবার করে যেতে হয়।

বাসন মাজার সময় মাঝে মাঝে একটা দৃশ্য আমার নজরে আসে। মালতী কলতলায় বসে বাসন মাজে, তার পিছনে লালমোহন চৌকাঠে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, এদৃশ্য আমি অনেকদিন দেখেছি। রান্নাঘরে দুজনে পাশাপাশি বসে এক সঙ্গে চা রুটি খায়। পাশাপাশি বসলেও ঘনিষ্ঠ হয়ে বসতে কোনদিন দেখিনি। এই বাসন মাজা এবং চা খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে তাদের মধ্যে মৃদুস্বরে কথা হয়, কি কথা হয় শুনিনি। সে সময় ওদের মুখের অভিব্যক্তি পৃথিবীর সমস্ত দুঃখকে ভুলিয়ে দেয়, জীবনের যেন একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। সেজন্যই বলছিলাম, বেশ ভাল আছে লালমোহন। আমি কি ওকে হিংসা করি?

—বাবু, আমাকে কিছু টাকা দিতে হবে।

প্রায় চমকে উঠেছিলাম। মালতী কখন ঘরে এসেছে টের পাইনি। জানতে চাইলাম হঠাৎ টাকার কি প্রয়োজন হল। মালতী জানাল যে তার ছেলের হঠাৎ পা দুটো অবশ হয়ে গেছে। ডাক্তার বলেছে সেরে যাবে কিন্তু চিকিৎসায় খরচ অনেক।

—কত টাকা দরকার?

—একশ।

—একশ! সে যে তোর চার মাসের মাইনে! শোধ করবি কি করে?

—শোধ যে ভাবেই হোক করে দেব।

—তোর স্বামী কি করছে?

—সে কি করবে! এখন কোন কাজ নেই। সেই পূজা এলে কিছুদিন চলবে ভাল। তাছাড়া সে-ই ছেলেকে কাঁধে নিয়ে রোজ ডাক্তারের কাছে যাচ্ছে, ছেলের সব কিছুই করছে।

মালতীর কথায় স্বামীর উপর কোন অভিযোগের সুর পেলাম না। সহানুভূতিই ফুটে উঠেছে। খুব ভাল লাগল। হঠাৎ মনে হল আমি তো এদের কথা কখনও ভাবিনি, এদের কথা বিশেষ কিছু জানি না, এদের সুখ দুঃখ, সমস্যা, জীবনের লক্ষ্য, প্রেম ভালবাসা বন্ধুত্ব, স্বামী স্ত্রীর সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে কতটুকু জানি আমি?

—বাবু।

এবার লালমোহনের গলা। লালমোহনের দিকে ফিরতে সে বলল—

—বাবু, ওকে আপনি টাকা দিয়ে দিন। মালতী শোধ না করতে পারলে মাইনে থেকে কেটে নেবেন।

একটু অন্যমনস্ক ছিলাম। প্রথমে কথাটা শুনেও বুঝতে পারিনি। লালমোহনের কথাটা আবার আমার কানে বেজে উঠতে আমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল। আমার সামনে যারা এতক্ষণ ভীড় করেছিল সবাই নিমেষের মধ্যে উবে গেল, তাদের কাউকে আর দেখতে পাচ্ছি না। আমার বর্তমান উপন্যাসের নায়ক নায়িকা নির্বাচনের সমস্যা মিটে গেল। আমি লিখব লালমোহন মালতীকে নিয়ে। নায়ক লালমোহন নায়িকা মালতী।

শোক

মদন দাস

এক মিনিট দাঁড়ান, আজ এখানে একটা শোকসভা হবে। আপনি তো এ অঞ্চলের বাসিন্দা? তাহলে এক মিনিট দাঁড়ান। আপনাদের জন্যই এখানে সভা করে শোক করবেন—

আজ এখানে সভা করে শোক করার জন্য আমরা মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে পেয়েছি। এখনই তিনি এসে যাবেন। আমরা সৌভাগ্যবান, এখনই টেলিফোন করা হয়েছিল, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সেক্রেটারী জানিয়েছেন যে তিনি ঠিক চারটায় রওনা হয়েছেন। এখন পাঁচটা, তিনি এলেন বলে। এক মিনিট দাঁড়ান।

আজ এখানে সভা করে শোক করার জন্য আমরা আর একজনকে পেয়েছি, তিনি আমাদের এম. এল. এ.। ঐ তিনি মঞ্চের ওপর বসে আছেন। আমাদের সৌভাগ্য আমাদের এম. এল. এ. আমাদের সঙ্গের সাথী। ঐ তিনি আজকের সভায় উপস্থিত। আপনি আসুন, একটু দাঁড়িয়ে যান, আজকের এই শোকসভায় যোগ দিন। দেখুন কী সুন্দর মঞ্চ বাঁধা হয়েছে। লাল টকটকে মঞ্চের ওপর দেখুন সকল স্থানীয় নেতারা কী ব্যস্ত। দেখুন সারামাঠ রাস্তা আর বাড়ীগুলি হাজার নিশানে লালে লাল। একটু দাঁড়ান, আজ আপনাদের জন্য স্থানীয় নেতারা কিছু বলবেন, আমাদের এম. এল. এ. কিছু বলবেন, এবং বলবেন মুখ্যমন্ত্রী। এঁরা সকলে আজকে শোক করবেন। আপনি একটু দাঁড়ান।

জানেন, ছোটবেলায় আমি ও বিজয় এই মাঠে খেলা করতাম। তখন এ মাঠের চারপাশে এতো বাড়ী হয়নি। তখন ঐ দক্ষিণ দিকে একটা বাগান ছিল।

অনেক বড় বড় গাছ ছিল। এই মাঠে তখন অনেক সবুজ ঘাস ছিল। আমরা গাছের তলায় আর সবুজ মাঠে কি যে করতাম—! সেটা ছিল আমাদের নিজস্ব রাজত্ব। সেখানে আমাদের কল্পিত রাজপ্রাসাদ ছিল, কোষাগার ছিল, অস্ত্রাগার ছিল, ছিল দুর্ধর্ষ সব ঘোড়া। সেখানে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ নিয়ে আসতো দৈত্য···

···ঐ বোধহয় মুখ্যমন্ত্রীর গাড়ী এসে গেল। বিকেলের শেষ রোদ ব্যস্ত গাড়ীটার মাথায় সোনার মুকুট পরিয়েছে। উদগ্রীব জনতা মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য ধেয়ে চলেছেন। ঐ দেখুন স্থানীয় নেতারা আর কর্মীরা ব্যস্ত ভাবে সকলকে সরিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে নির্ঝঞ্ঝাট করছেন। জনতা যাঁকে ছবিতে দেখেন তাঁকে রক্ত মাংসের শরীরে দেখতে বড় আকুল হন। এই তো আজকের সংবাদপত্রের প্রথম পৃষ্ঠায় মুখ্যমন্ত্রীর বড়সড় ছবি বেরিয়েছে। গতকাল মুখ্যমন্ত্রী কি যেন একটা উদ্বোধনে সভাপতিত্ব করতে গিয়েছিলেন তার ছবি।

আমার কাছে বিজয়ের একটা ছবি আছে, বিজয় আর আমি একসঙ্গে। যখন আমরা কলেজে পড়তাম তখন একবার 'পিকনিক' করতে গিয়েছিলাম—বোটানিক্যাল গার্ডেনে—সেখানে কে যেন ছবি তুলেছিল—সেই বিখ্যাত বিশাল বট গাছের কাছে—সেই ছবিটা আমি খুব যত্ন করে রেখে দিয়েছি। সত্যি কথা বলতে কি আমার আর কোনো ছবি কখনও তোলা হয়নি। বিখ্যাত সব লোকেদের কত ছবি তুলে নেয় ফটোগ্রাফার! বিখ্যাত লোকেরা তাকিয়ে দেখারও প্রয়োজন বোধ করেন না কিন্তু আমাদের কাছে এক টুকরো ঐ ছবি অনেক।

জানেন—আমার কিন্তু ধারণা ছিল বিজয় একদিন খুব বড়ো নেতা হবে, এম. এল. এ. হবে, মন্ত্রী হবে, বিজয়ের ছবি কাগজে কাগজে ছাপা হবে। তখন আমরা কলেজে পড়ি। তখন আমাদের বুদ্ধি যথেষ্ট পরিণত হয়নি। যেমন আমি নিজেকে নিয়ে ভাবতাম—আমি বি. এ. পাশ করেই একটা ভালো চাকরি পেয়ে যাবো, তারপর আর কি—সুখের দিন!

তখন বিজয় ছাত্রনেতা ছিল। জানেন—তখন ও মাইকের সামনে দাঁড়িয়ে কি উদ্দাম বক্তৃতা করত। তখন আমরা ভাবতাম বিজয় একদিন বড়ো নেতা হবে, এম. এল. এ হবে মন্ত্রী হবে···

এসব কথা বিজয়কে বলতে গেলে বিজয় কিন্তু রেগে যেতো। ভীষণ উত্তেজিত গলায় আমাকে ধমকাতো। বলত, তোদের বড় ছোট মন। আমাদের এই দরিদ্র

পঙ্গু নীতিহীন শোষণে শোষণে কি যেন একটা কথা বলত—হ্যাঁ। জর্জরিত দেশটাকে আমূল সংস্কার করতে হবে। আনতে হবে সাম্যবাদ, তখন শোষক—শোষিত থাকবে না, ধনী দরিদ্র থাকবে না, মালিক—শ্রমিক থাকবে না, তৈরি হবে সর্বহারাদের সরকার, খেটে খাওয়া মানুষের দেশ, সকলের সমান অধিকার।

—এসকল অনেক কথা বলত বিজয়। তার শৈশবের সাথী আমি যৌবনের বন্ধু তার প্রতিটি কথা আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনতাম, মনে প্রাণে বিশ্বাস করতাম। আমি বিশ্বাস করতাম এমন দিন আসবে যেদিন সকলে সমান করে ভাগ করে নেবে দুঃখ · সুখ ···আপনি বিশ্বাস করুন আমার বিশ্বাসে কোনো খাদ ছিল না। কিন্তু তারপর অনেক অ-নে-ক সময় পেরিয়ে গেছে। আজ আমি অনেক ধাক্কা খেতে খেতে বিজয়ের পথ থেকে অনেক দূরে সরে গেছি। আমি তার আদর্শে আস্থা রাখতে পারিনি। নিজে বাঁচবার আর পরিবারকে বাঁচাবার প্রশ্ন আমার কাছে বড় হয়ে উঠেছে।

আপনি ক্লান্ত বোধ করছেন? আর একটু দাঁড়ান। ঐ শুনুন মাইকে গণ-সংগীত বেজে উঠেছে। মঞ্চের দিকে তাকিয়ে দেখুন গায়ক গায়িকারা সমবেত কণ্ঠে গণসংগীত গাইছেন। ঐ দেখুন মুখ্যমন্ত্রীকে ধবধবে নিকলঙ্ক পোষাকে কী সুন্দর লাগছে। উনি গাড়ী থেকে নেমে মঞ্চের দিকে চলেছেন। জনতা তাঁদের প্রিয় নেতাকে স্বাগত জানাচ্ছেন। আহ্ বিজয়ের আদর্শ নেতা আজ এখানে উপস্থিত। বিজয়ের কি ভাগ্য!

এটা উনিশো উনআশি সাল, জানেন—বছর দুয়েক আগেও বিজয়কে আত্ম-গোপন করে থাকতে হয়েছিল। তখন অন্য রাজত্ব, অন্য সরকার—আঃ! আপনাকে আর নতুন কি বলব! আপনি তো যথেষ্ট বয়স্ক একজন ভারতীয় নাগরিক। আপনি অনেকবার ভোট দিয়েছেন, সব খবরই রাখেন। তখন জরুরী অবস্থা, সব কিছু ঐ এক আইনে কুলুপ আঁটা। তাবড় তাবড় নেতারাও তখন টুঁ শব্দ করতে ভুলে গেছেন।

যাই হোক বিজয়ের তখন আত্মগোপন পর্ব চলেছে। আমি তখন অনেক আগে থেকেই অন্য লাইনে চলে গেছি। আমার মনে পড়ে বিজয়ের প্রথম ধিক্কার—কিন্তু আপনি বিশ্বাস করুন আমার না করে উপায় ছিল না। তখন বাবা মারা গেছেন, বাবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ডের টাকা ক্রমশঃ শেষ হয়ে আসছে। বাড়ী ভাড়া ভাই বোনদের লেখাপড়া এমনকি মায়ের পরণের কাপড়টুকু পর্যন্ত অনেক দূরের

ব্যাপার দুবেলা শুধু দুমুঠো খাওয়া জোগানো দায় হয়ে উঠেছে। তখন সেই বিভীষিকার ছায়া থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য আমরা ছটফট করেছি।

একটা ব্যাপারে সকল সরকার কিন্তু এক নীতি নিয়ে চলেন। আপনাকে কি আর বলব, আপনি বয়োজ্যেষ্ঠ সংসারী মানুষ, আপনি সেই ব্রিটিশ আমল থেকে দেখে আসছেন এই রেশন ব্যবস্থা। তারপর দেশ স্বাধীন হয়েছে। অনেক সরকার এলো গেল—এই রেশন ব্যবস্থা ঠিক আছে—বলুন? ঐ রেশনের লাইন ধরে আমি অন্য লাইনে চলে গেলাম। কিভাবে হলো শুনুন - রেশনে যা চাল দেয় খেতে কুলোয় না। বাজারে অঢেল চাল কিন্তু দাম অনেক। কিন্তু পেটতো মানেনা! আমি সেজন্য বাজার থেকে চাল না কিনে কিছু পয়সা বাঁচানর জন্য বিনা টিকিটে ট্রেনে চেপে 'নন-রেশনিং' এলাকায় যেতাম, সংসারের জন্য কিছু চাল কিনে আনতাম ··

এভাবে আমি দেখলাম অনেক লোক এ লাইনে করে খাচ্ছে। অধিকাংশ জনই খুবই সাধারণ ছেলে ছোকরা বৌ ঝি। আমিও নেমে পড়লাম। অন্তত বি. এ. টা না টুকেই পাশ করেছি, বুদ্ধিটা একটু পরিষ্কার—ছোট ভাবে আরম্ভ করে আমি বুদ্ধির জোরে একটু প্রশস্ত হলাম।

তখন দেশে জরুরী অবস্থা বহাল। তখন সরকারপক্ষের সমর্থকদের পোয়াবারো। সব সুবিধাবাদী তালে তাল দিয়ে সেই সমর্থকের দলে ভিড়ে গিয়ে যে যার গুছিয়ে নিচ্ছে, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে দুনিয়া। আমিও তখন অনেক কিছু শিখে ফেলেছি। আমি শিখে ফেলেছি কিভাবে ঠিক ঠিক জায়গায় ঘুষ পৌঁছে দিয়ে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারীদেরই ছত্রছায়ায় নিশ্চিন্তে থাকা যায় আর যা খুশী করা যায়।

তখন আমি পুরোপুরি তৈরী হয়ে গেছি। আমার বেশ কিছু চেলাচামুণ্ডা জুটে গেছে। আমি মদের বোতল খুলতে শিখে গেছি। তা এই মদের বোতল গলায় উপুড় করতে গিয়ে চেলাদের সঙ্গে আমি একটা জিনিষ আবিষ্কার করলাম, নিশ্চিন্তে বসে মদ খাওয়ার জায়গার বড়ো অভাব। এ অঞ্চলে মদের দোকান আছে কিন্তু বসে খাওয়ার 'বার' নেই।

অবশ্য চোলাই মদের কারবারের বেশ কয়েকটা ঘাঁটি এ অঞ্চলে আছে। আপনি ভালো মানুষ নির্ঝঞ্ঝাট, ছাপোষা মানুষ আপনি বিয়ার হুইস্কি কিংবা চোলাই মদের গন্ধও জানেন না, সেই আপনিও নিশ্চয় রোজ বাজার করতে গিয়ে

পরিষ্কার দেখেছেন বাজারে তিন চার জায়গায় চোলাই ঢেলে ঢেলে বিক্রি হচ্ছে? কি বলছেন? লক্ষ্য করেছেন? না করবার কি আছে! যেখানে যা প্রণামী দেবার ওরা ঠিক ঠাক পৌঁছে দেয় সুতরাং ভয় কাকে বলুন? বাজারে এই চারটি চোলাই দোকানের মালিক চারজন আর ওদের যে চোলাই মদ জোগান দেয় সেই ছুন্নু মস্তান এরা অনেক রথী মহারথীকে বগলে পুরে রাখে, সুতরাং —

তা যাক্ চোলাই মদের কথা, আমি বিয়ার হুইস্কির কথা বলছিলুম—হ্যাঁ নিশ্চিন্তে একজায়গায় বসে গলায় ঢালবার জায়গার বড়ো অভাব। অথচ অনেকেই একটু আধটু মাল খেতে চায় কিন্তু ইচ্ছা থাকলেও উপায় নেই, প্রথমতঃ জায়গার অভাব দ্বিতীয়ত এক দু পেগ্ খেতে গেলেও পুরো বোতল কিনতে হবে, অনেকগুলো টাকার ব্যাপার।

ভাবতে ভাবতে বুদ্ধিটা মাথায় এসে গেল আর আমিও কাজে নেমে পড়লুম। মোড়ের মাথায় একটা ঘর জোগাড় করে 'কোল্ড ড্রিঙ্কস্' আর বরফের দোকান, খুলে ফেললাম। যতো সব 'ক্যাম্পাকোলা' আর 'থাম্বস্ আপ্' 'চবল্ সোডেন' আর 'নোভা'র বোতল সাজিয়ে আর কাঠগুঁড়ো চাপা বরফের চাঁই রেখে পুরোদস্তুর দোকান খুললাম, ভেতরে পর্দাফেলা সুন্দর একটা ছোট কামরা যেখানে বসে বসে খদ্দেররা ঠাণ্ডা বোতল খাবে আর গল্প করবে।

এই মোড়ের কাছাকাছিই মদের দোকান সেখান থেকে অনবরত বোতল কিনে ব্যাগে পুরে এ দোকানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা হয়ে গেলো, একজন চেলাকে মাইনে আর কমিশন দিয়ে দোকানে বসিয়ে দিলাম। এসব কারবার কিন্তু যথাযথ জায়গায় জানিয়েই শুরু করলাম। ঠিকঠাক ঘুষটুষ যথাযথ জায়গায় পৌঁছে দিয়ে নিশ্চিন্তে ঢালাও কারবার চলতে লাগল। আর খদ্দের? সে আপনি ভাবতেও পারবেন না, দিয়ে শেষ করা যায় না।

কারবারটা কিন্তু ছুন্নু মস্তান আর তার চার সাকরেদের গায়ে জ্বালা ধরালো। হাজার হোক চোলাই কমদামী জিনিষ, তার আবার চোলাই করার ঝামেলা। অথচ আমার কারবার দামী কারবার। দোকান থেকে ঝকঝকে লেবেল মারা বোতল কিনে আনো আর খুলে ঢালো।

ওরা আমাদের পেছনে লাগবার চেষ্টা করলো। কিন্তু ওরাও যেরকম যথাযথ জায়গায় পুজো দেয় আমিও দিই, সেদিক থেকে কিছু করার উপায় নেই, তখন

করল কি খদ্দের সাজিয়ে দু চারজন হারামি লোককে পাঠিয়ে আমার দোকানে গোলমাল বাধাতে চাইল।

কি যাচ্ছেতাই ঝামেলা বলুন! তোরা তোদের কারবার করছিস আমি আমার কারবার করছি, তা আমার পেছনে তোরা শুধুশুধু লাগছিস্ কেন?

ও হো! আপনাকে বিজয়ের কথা বলছিলাম, এখন নিজের গল্পই শোনাচ্ছি! হ্যাঁ, বিজয়ের বাড়ীর অবস্থা কিন্তু ভালো নয়। ওর বাবা বড়বাজারে একটা কাপড়ের দোকানে চাকরি করেন, মাইনা সামান্য। বিজয় টিউশনি করে কিছু রোজগার করত, কিন্তু প্রাণের ভয়ে তখন আত্মগোপন করে আছে কোথায় কে জানে! এদিকে এলেই তার সর্বহারাদের পার্টি করার পিঠি চটকে দেবে গুণ্ডাবাহিনী। কিংবা জরুরী অবস্থার আইনে সোজা লকআপে পুরে দেবে সরকার।

আমি জানেন, ওর জন্য এটুকু করতাম, কিছু কিছু টাকা ওর মায়ের হাতে দিয়ে আসতাম।

কিন্তু একদিন রাতে বিজয় আমার বাড়ী এলো, আমাকে ধিক্কার দিলো তারপর বলল, 'আমার মাকে তুই টাকা দিবি না। তোর নোংরা টাকায় আমাদের স্বাচ্ছন্দ্য দরকার নেই।'

আমি বললাম, 'বিজয় তুই আলেয়ার পেছনে ছুটছিস। এখন এই দেশটার প্রত্যেকটি মানুষ শুধু নিজে গুছিয়ে নেওয়ার তাল করছে, তা সে যে কোনো পথেই হোক। কোথায় তোদের সংগ্রাম আর তোদের নেতাদের সংগঠন দেশের বনিয়াদ তৈরী করছে আমায় দেখা।' বিজয় বলল, 'তুই নোংরা মেখে আছিস, সেই নোংরা গন্ধে তোর নাক বুঁজে আছে। তুই সুগন্ধ বুঁজে পাবি না, কিন্তু আছে, সুগন্ধ আছে, দেশ ঠিক একদিন গড়ে উঠবে, সেদিন তোরা সকলের পায়ের তলায় পিষে মরে যাবি'—বলতে বলতে বিজয় রাতের অন্ধকারে আবার হারিয়ে গেল। আমি সেদিন অনেক মদ খেলাম, নিজেকে ভুলতে চাইলাম, বিজয়কে ভুলতে চাইলাম।

দেখুন, দেখুন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে, উনি সাদা ফুলের কি বিশাল স্তবক শহীদ বেদীতে সাজিয়ে দিলেন। জনতা উদ্বেল হয়ে আওয়াজ তুলল। মুখ্যমন্ত্রী ডান হাত তুলে তাদের শান্ত হতে বললেন। তাঁর প্রসারিত দক্ষিণকরে কি বরাভয়! জনতার বুক ভরে উঠল। শুনুন উনি দু মিনিট নীরবতা পালন করতে বলছেন। আসুন আমরা দু মিনিট নীরবতা পালন করি। আজ এই শোকসভার জন্য অনেকে

অনেক কিছু করেছে। যেমন ছুর আর তার সাকরেদরা বাজারের চোলাই দোকান ধুয়ে মুছে সাফ্ করে ফেলেছে, একটা ফাঁকা বোতলও রাখেনি। এইতো দু পা গেলেই বাজার, আমার কথা বিশ্বাস না হয় নিজে গিয়েই দেখে আসুন! আজ আমার ঠাণ্ডাপানীয়ের দোকান বন্ধ। আজ মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এখানে শোকসভা করছেন, আজ এখানে পুলিশে পুলিশে ছয়লাপ; আজ যথাযথ জায়গা থেকে আমাদের ওপর নির্দেশ এসেছে কারবার আজকের মতো বন্ধ রাখার জন্য। আজ বিজয় এসে দেখে যাক্ অন্ততঃ একটা দিনের জন্যও আমি ভালো হয়ে গেছি। এক পেগ্ মদও সারা দিনে বিক্রি করিনি।

বিজয় বারণ করলেও আমি কিন্তু ওর মাকে টাকা দিতে গেলাম। কিন্তু জানেন, ওর মা আমাকে ফিরিয়ে দিলেন, বললেন, 'বিজয় বলেছে তুমি নাকি নোংরা পথে টাকা রোজগার করো, আমরা ও টাকা নেবোনা বাবা, তুমি কিছু মনে করোনা।' বললেন, 'বিজয় বলে গেছে কিছুদিন কষ্ট করতে, বোধ হয় জরুরী অবস্থা উঠে যাবে, ভোট হবে, তখন সে বাড়ী আসবে আবার কিছু না কিছু রোজগার করবে।'

তাই হোলো, আপনি তো জানেন, কোথা দিয়ে কি যেন ওলোট পালোট হয়ে গেল, দেশে ভোট হলো, জনসাধারণ আবার ভোট দিলো পাল্টা নেতারাও এতটা ভাবতে পারেন নি, কারণ একবার জনসাধারণের ভোটে তাঁরা সরকার গড়ে তারপর নিজেদের মধ্যে যে খেয়োখেয়ি করেছিলেন সেই লজ্জাজনক ঘটনার কথা কেউই ভোলেননি।

কিন্তু জনসাধারণ আবার তাঁদের সুযোগ দিলেন। সারা ভারত জুড়ে নতুন ঢেউ, জরুরী অবস্থা নেই পীড়ন নেই। বিজয় ফিরে এলো।

আমরা কিন্তু ভয় পেলাম। ভাবলাম এবার আমাদের কারবার উঠলো। যথাযথ জায়গা থেকে কিন্তু আমাদের অভয়বাণী শোনানো হ'লো—একটু হুঁশেসেয়ে চালিয়ে যাও, কিছু ভয় নেই। আমরা নিশ্চিন্ত হলাম। কারবার যথারীতি চলতে লাগল, তফাতের মধ্যে আগে যেসব স্থানীয় নেতাদের তেল দিতাম এখন আর তাদের পাত্তা দিই না, এখন বিজয়দের পার্টি সরকার গড়েছে সুতরাং সেসব নেতাদের তেল দিতে চেষ্টা করি। বিজয়কেও আমি একটু তেল দিতে চাইতাম, কিন্তু বিজয় আমাকে দেখলে মুখ ফিরিয়ে দ্রুত পায়ে চলে যেতো, তার মুখে ঘৃণা ফুটে উঠতো, সুতরাং আমি ওকে এড়িয়ে চলতে থাকলাম। যাতে না মুখোমুখি পড়ি এ ব্যাপারে যথেষ্ট সচেতন থাকতাম। বিজয়দের পার্টি সরকার গড়েছে, বিজয় যদি বিরূপ

হয়ে আমার পেছনে লাগে তাহলে কারবার যাবে। যদিও যথাযথ জায়গায় ঠিকঠাক ঘুষ দিয়ে চলেছি তবু কি দরকার! কথায় বলে সাবধানের মার নেই।

উচ্ছাস থিতিয়ে এলে সবকিছুই আবার আগের মতোই চলতে লাগলো। জানেন কোনো পরিবর্তন নেই, এ সরকারের মন্ত্রীরাও আগের সরকারের মন্ত্রীদের মতোই চলতে থাকলেন। এ সরকারের অধীনে সরকারী কর্মচারীরা আগের সরকারের অধীনের কর্মচারীদের মতোই চলতে থাকলো। এ আমলেও মালিক শ্রেণী আগের আমলের মতোই চলতে থাকলো। এ আমলেও চোরাকারবারীরা আগের আমলের মতোই—আপনি হাসছেন? হাসবেননা, আজ এখানে একটা লোকসভা হচ্ছে, দুমিনিট নীরবতা পালন হয়ে গেছে, এখানে স্থানীয় এম, এল, বক্তৃতা করছেন. এরপর মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণ, দেখুন জনতা কেমন উদ্‌গ্রীব হয়ে বক্তৃতা শুনছে।

অবশ্য কিছু পরিবর্তন হয়েছে, যেমন পার্টির কর্মীদের এখন আত্মগোপন করে থাকতে হয়না এখন আর জরুরী অবস্থার হুমকি নেই, বিজয় আবার টিউশানি' করতে পারছে এবং বেকারভাতা পাচ্ছে মাসে মাসে। এসব নিয়ে আমার মাথা ঘামাবার দরকার নেই, আমার কারবার দারুণ চলছিল, বছর ঘুরলেই জমি কিনে বাড়ী করবার উদ্যোগ করলাম। মায়ের ইচ্ছা, এবার আমি বিয়ে করি, তা আমারও ইচ্ছা বাড়ীটা তৈরী হলেই বিয়ে করে ফেলবো।

ছুন্নুরা বেশ শান্ত ছিল। আমার পেছনে আর বিশেষ লাগতোনা, কিন্তু আমি যেই বাড়ী তৈরী শুরু করলাম তখন ওদের ভীষণ আঘাত লাগলো। এতোবড়ো বাড়ী তৈরী করছি! ব্যাটারা যেন ক্ষেপে গেল। রোজ আমার দোকানে হামলা করতে লাগলো।

আমি অনেক সহ্য করলাম, জানেন, কিন্তু কাঁহাতক আর পারা যায়? একদিন আমি ভেলো চামুণ্ডাদের নিয়ে আর কিছু গুণ্ডা জুটিয়ে সন্ধ্যাবেলা বাজারে ঢুকে চারটে দোকান তছনছ করে দিলাম। সন্ধ্যাবেলা জমাটি কারবার, অনেক মাল নষ্ট হলো। এইতো কদিন আগের ব্যাপার দু হপ্তাও হয়নি। কিন্তু আমি একটু ভুল করেছি. আমার উচিত ছিল সেদিন ছুন্নুকে একেবারে শেষ করে দেওয়া, তাকে শেষ করে দিলে সে আর এরকম মর্মান্তিক ঘটনা ঘটাতে পারতো না। আমি খুব ভুল করেছি। খুব ভুল করেছি!

আমাদের একহাত দেওয়ার জন্য ছুন্নুরা তাল খুঁজছিল। আমিও একটু সাবধানে ছিলাম। বাজারে চালের দোকানে কদিন যাইনি। কিন্তু না গিয়েও

উপায় নেই, কারবারটা যে ছোকরাকে দেখতে দেওয়া আছে সে ব্যাটা চুরি করে ফাঁক করে দেবে। পরশু দিন বেলা নটা নাগাদ আমি দুজন চেলাকে নিয়ে বাজারে গেলাম। ওরা তৈরীই ছিল, আমি পৌঁছবা মাত্র লাঠি সোঁটা ছোরাছুরি নিয়ে ঘিরে ধরল।

আমার সঙ্গেও চেম্বার থাকে, জানেন, অটোমেটিক, আমার নিশানাও নিখুঁত, গুলি চালালে কোন বাছাকে আর ফিরতে হবে না! আমি চেম্বার হাতে নিলাম—ওরা একটু থিতিয়ে গেল, কিন্তু শুরু করল গালাগালি আর তড়পানি। সে একটা বিশ্রী ব্যাপার, চারিদিকে থৈ থৈ লোকজন। সকাল আটটা—বাজারের সময়। ও-আপনি তখন বাজারে ছিলেন? দূর থেকে দেখেছেন?

বিজয়ও বাজার করতে এসেছিল, জানেন। সব জায়গায় কর্তালি করা ওর অভ্যাস। এখন আবার ওদের সরকার সুতরাং ওর এরকম ধারণা যে সব জায়গায় শান্তি রক্ষা করা আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার ওর অধিকার। আরে আহাম্মক আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারীরা সব বিক্রি হয়ে গেছে বাজারে, তুই কিংবা তোর মন্ত্রীদের চোদ্দগুষ্টি কিচ্ছু করতে পারবে? খামোকা আগ বাড়িয়ে এসে কর্তালি শুরু করলো—তোমরা এখানে কেন ঝামেলা করছ ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি বিজয়কে এড়িয়ে চলি, সুতরাং আমি আস্তে আস্তে সরে পড়লাম, আমার চেলারাও আমাকে অনুসরণ করল কিন্তু ছুন্নুর চার সাকরেদ খুবই ক্ষেপে গেল, এক তো শিকার হাতছাড়া, দুই বিজয়ের কর্তাপনা।

আঃ! আমি যদি চলে না যেতাম! আমি যদি বিজয়কে সরিয়ে দিতাম, যদি গুলি করে শেষ করে দিতাম ছুন্নু আর তার সাকরেদদের!

তারপর নাকি বিজয়ের সঙ্গে অনেক বচসা হয়েছিল ওদের, চারিদিকে প্রবল জনতা ওদের ঘিরে ধরেছিল, অনেকেই বিজয়কে চেনেন, মানেন, তাঁরা বিজয়কে সমর্থন করেছিলেন, বিজয় আরও জোর পেয়েছিল, বলেছিল আমি তোমাদের চিনি তোমরা বাজারে মদ বিক্রি করো, গরীব মানুষদের মেরুদণ্ড ভেঙে দিচ্ছ তোমরা—এইসব অনেক বক্তৃতা—আমাকে পরে একজন জানিয়েছে।

ওরা তখন মরিয়া, একজনের কাছে ব্যাগে কয়েকটা হাতবোমা ছিল একটা বোমা সোজা চালিয়ে দিলো বিজয়ের মাথায় তারপর এলোমেলো এদিক ওদিক ছুঁড়ে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে পালালো।

জনতা তাদের ধাওয়া করেছিল। জনতা একজনকে ধরে ফেলে পিটিয়ে মেরেছে। বাকিরা বেপাত্তা। কিন্তু আশ্চর্য, পুলিশ কাউকে ধরতে পারেনি।

এক মিনিট দাঁড়ান। আজ এখানে একটা শোকসভা হচ্ছে। আপনি বিজয়কে চিনতেন? দেখবেন তার ছবি? আমার বুক পকেটে একটি ছবি আছে বিজয় আর—না আপনাকে সে ছবি দেখতে হবে না। সে ছবিতে বিজয়ের পাশে আমি আছি।

শুনুন, মুখ্যমন্ত্রী কি বলছেন। দেখুন ওঁর উজ্জ্বল মুখ। কি দৃঢ় ওঁর কণ্ঠস্বর! ওঁর বক্তৃতা শুনুন, আজ এখানে ওঁরা সভা করে শোক করতে এসেছেন। আপনি শুনুন, দেখুন, ওদের শোক অনুভব করুন।

আমি চলি, শুনছেন? আমি চলি। আমার এখানে দাঁড়াতে ঘেন্না করছে! আমি একটু আগে আরেক শোকসভায় গিয়েছিলাম, নিঃশব্দে গিয়েছিলাম নিঃশব্দে পালিয়ে এসেছি। সেখানে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়ে আছেন এক জননী, তাঁর চারপাশে এক বৃদ্ধ আর তিনটি কিশোর কিশোরী শূন্য দৃষ্টি নিয়ে ঘিরে বসে আছে।

তুই কোন্ সর্বহারার রাজ্যে চলে গেলি বিজয়? তোর মাকেও একবার বলে গেলি না?

শ্রীবলিন দত্ত কর্তৃক ৩০/১-এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং লক্ষ্মী নারায়ণ প্রেস, ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত।

KRISHANU
Quarterly

Vol. XII No. I
Rs. 3.00

Regd. No.
RN 16533/68

With best compliments from :

Phone : 45-6894
45-1220
45-7925

Gram : ASIANIND

HIRA LAL MODI
(Transport)

27, TOLLYGUNGE CIRCULAR ROAD,
CALCUTTA-700053.

CONTRACTORS :

- **Food Corporation of India**
- **Calcutta Corporation**
- **C. M. D. A.**

METRO Railway Project Under :

1) National Projects Construction Corporation Ltd.
2) National Buildings Construction Corporation Ltd.
3) Hindustan Steel Works Construction Ltd.